(আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের আদর্শপ্রবন্ধ-সংগ্রহ)

"বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক"-সঙ্কলয়িতা

সম্পাদিত

PRABANDHA-RATNA

OR

Selections from Modern Bengali Prose

EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES
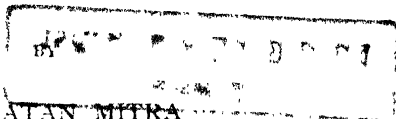
SIVA RATAN MITRA

Author of "Bangiya Sahitya-Sevaka" etc.

Price Annas Twelve only.

ভূমিকা

সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিপুলায়তন হইলে, সাহিত্যিকমধ্যে সঙ্কলন ও সঞ্চয়-বৃত্তি স্বতঃই স্ফুরিত হয়। নির্দ্দিষ্ট সূত্রাবলম্বনে বিভিন্ন লেখকগণের রচনা পর্য্যায়-ভুক্ত করিবার প্রথা কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য সাহিত্য, সর্ব্বত্রই সমভাবে প্রচলিত আছে। *Chambers' English Literature, English Essayists* প্রভৃতি সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্য-সংগ্রহ-গ্রন্থ যে কত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

বঙ্গভাষায় এইরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থের সঙ্কলন কার্য্য বহুদিন অবধি আরব্ধ হইয়াছে। ষোড়শ খৃষ্টাব্দে, আউল মনোহর দাস 'পদসমুদ্র'-নামক সুবৃহৎ সঞ্চয়-গ্রন্থে পঞ্চদশসহস্র পদ সংগৃহীত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে প্রসাদ দাস 'পদচিন্তামণিমালা', রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র' (১৭১০ খৃঃ), বৈষ্ণবদাস 'পদকল্পতরু', হরিবল্লভ দাস 'গীত-চিন্তামণিমালা', নরহরি 'গীতচন্দ্রোদয়', ও গৌরীমোহন দাস 'পদকল্পলতিকা' গ্রন্থে, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পদরত্নাবলী আলঙ্কারিক সূত্রানুযায়ী অপূর্ব্বভাবে গ্রথিত করিয়া সংগ্রহ-সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, মহাশয়গণ কর্ত্তৃক প্রাচীন কবির রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশ, এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ মহাশয় "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়"-নামক বিপুলকায় সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া বঙ্গভাষার সঞ্চয়-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

কিন্তু, প্রাগুক্ত যাবতীয় সংগ্রহ-গ্রন্থেই কেবলমাত্র পদ্যসাহিত্য সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রাচান বঙ্গভাষার গদ্য-সাহিত্যের একান্ত অভাবই যে তাহার একমাত্র কারণ, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে, বঙ্গভাষায় যথারীতি গদ্য-সাহিত্যের প্রসার অতি অল্পদিনমাত্র আরব্ধ হইয়াছে। তথাপি আশা ও গৌরবের কথা এই যে, এই অত্যল্পকাল মধ্যেই পাশ্চাত্যভাবে প্রণোদিত হইয়া বঙ্গভাষার অকৃত্রিম মনাষী সেবকবৃন্দ গদ্য-সাহিত্যকে অপূর্ব্বরূপ বিভবশালী করিয়া তুলিয়াছেন। কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক যে কোন জটিল বিষয় হউক না কেন, বঙ্গভাষার গদ্য-সাহিত্য এখন অবলীলাক্রমে তৎসমুদয় অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহিভাবে পরিব্যক্ত করিয়া সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং, এখন এই গদ্য-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে রত্নাবলী সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিবার চেষ্টা অসাময়িক নহে।

বিভিন্ন কৃতী সাহিত্যিকগণের বিভিন্ন বিষয়াবলম্বনে রচিত প্রবন্ধাবলী-সংগ্রহ বালকগণের মনোভাব প্রকাশ ও রচনা-ভঙ্গি

শিক্ষা করিবার পক্ষে যে যথেষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহা শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষগণও প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিদ্যালয়-পাঠ্য বহু কবিতা-সংগ্রহ-গ্রন্থ বর্ত্তমান রহিলেও, উপযুক্ত গদ্য-সাহিত্য-সঞ্চয়-গ্রন্থের একান্ত অভাব। "প্রবন্ধরত্ন" গ্রন্থে এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে নিরাকরণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

'প্রবন্ধ-রত্ন' গ্রন্থখানি পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। যে সকল গ্রন্থকার ১৮২০ হইতে ১৮২৪ খৃঃ মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইভাবে দ্বিতীয় খণ্ডে, ১৮২৫ হইতে ১৮৪০ খৃঃ,তৃতীয় খণ্ডে ১৮৪১ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ, চতুর্থ খণ্ডে ১৮৪৯ হইতে ১৮৬০ খৃঃ এবং পঞ্চম খণ্ডে ১৮৬১ হইতে ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত সময়ে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে পরোলোকগত ১৩ জন, বর্ত্তমান ১৫ জন সাহিত্যিকের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে, প্রত্যেক খণ্ডেই বালকগণ যাহাতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ক রচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের সাধ্যমত যত্ন ও অনুষ্ঠানের কোনরূপ ত্রুটী করি নাই। বিষয়ানুযায়ী সূচীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রবন্ধাবলীর বৈচিত্র্যের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। কি সাহিত্য বিষয়ক, কি বিজ্ঞান বিষয়ক, কি প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক, কি গার্হস্থ বা ঐতিহাসিক চিত্র বিষয়ক, কি সমালোচনা বিষয়ক সর্ব্ববিধ রচনাই যথাযোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বি-

শেষে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, সর্ব্ববিধ দেশ-বিখ্যাত মহানুভবগণের চরিত্রচিত্র-সংবলিত প্রবন্ধাবলী সংগ্রহের অভাব পরিদৃষ্ট হইবে না। ফলতঃ এই গ্রন্থে বর্ণন বিষয়ক (Descriptive), বিবৃতি বিষয়ক (Narrative) ও পর্য্যালোচনামূলক (Reflective) সর্ব্ববিধ রচনার আদর্শ প্রদর্শিত হওয়ায় বালকগণ সর্ব্ববিধ প্রবন্ধ রচনার উৎকৃষ্ট আদর্শের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে।

এইরূপ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ সঞ্চয় যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের তাদৃশ অনুভবগম্য নহে। রচনাভঙ্গি ও বিবৃত বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বালকগণের উপযোগী প্রবন্ধ সঙ্কলন করিতে গিয়া অনেক দেশ-বিখ্যাত সাহিত্যিকের অত্যুৎকৃষ্ট রচনাবলী পরিহার করিয়া অশেষরূপ কষ্ট অনুভব করিয়াছি। পক্ষান্তরে, যে সকল গ্রন্থকারগণের রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাই যে সর্ব্বস্থলে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি তাহা নহে। তাঁহাদের নিকট এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বালকগণের প্রতি মমতাবশতঃ এবং মাতৃভাষার কল্যাণ কামনায় যে সকল গ্রন্থকার এই সংগ্রহ-পুস্তকে তাঁহাদের রচনাবলীর আদর্শ মুদ্রিত করিবার জন্য সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ায় 'প্রবন্ধরত্নের' তৃতীয় খণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সামান্যমাত্রও রচনা সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই।

'প্রবন্ধ-রত্নে'র প্রত্যেক প্রবন্ধেই বিষয়-নির্দ্দেশক পার্শ্ব-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। এই পার্শ্ব-সূচী হইতে, রচনার আলোচ্য বিষয় ক্ষণমাত্রেই বালকগণের স্মৃতিপথে উদিত হইবে। যে সকল প্রবন্ধে, পূর্ব্বে কোন আলোচ্য বিষয়ের নির্দ্দেশ আছে, সেই সকল প্রবন্ধের শিরোদেশে মুখবন্ধস্বরূপ পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 'ক'-পরিশিষ্ট অংশে, কেবলমাত্র সন্ধান-মূলক শব্দ বা বাক্যের বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। বালকগণের স্বাবলম্বনবৃত্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে পারে, আশঙ্কা করিয়া দুরূহ শব্দের প্রতিশব্দ প্রদান করি নাই; শব্দাভিধান সাহায্যে তাহারা তৎসমুদয়ের আলোচনা করিবে। প্রকৃষ্টরূপে ভাষান্তরিত করিতে শিক্ষা করিলে উভয় ভাষার জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া দুরূহ শব্দাদির ইংরাজী প্রতিশব্দ প্রদান করিয়াছি। ভরসা করি, ইহাতে বালকগণের যথেষ্টরূপ সাহায্য হইবে। 'খ'-পরিশিষ্টে গ্রন্থকারগণের বর্ণানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রকাশ বিষয়ে আমার সদাশয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমায় সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্টরূপ সাহায্য করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি

বীরভূম
১০-৩-১৫

শ্রীশিবরতন মিত্র

বিষয়ানুযায়ী প্রবন্ধ-বিভাগ

Contents—Classified.

১। চরিত-কথা—(Character Sketches)

Sarada Charan Mitra

অক্ষয়কুমার দত্তের কথা—Memoirs of Akshay Kumar Dutt— চ, ২১-৩৫

Jogindra Nath Bose

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাল্যশিক্ষা—Early training of Michael Madhusudan Dutt at home and at school চ, ৩৬-৪০

Rajani Kanta Gupta

ভূদেব ও মাইকেলের জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব—Influence of English Education on Bhudeb and Michael Madhusudan চ, ১০-১৩

—o—
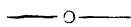
২। নীতি-কথা—(Moral Pieces)

Akshay Kumar Dutt

পরিশ্রম—Labour—physical and mental প্র, ১-৮

Bhudeb Mukharji

অতিথিসেবা—Reception of Guests— দ্বি, ১-৭

রোগীর সেবা—Nursing দ্বি, ৮-১৩

Chandrasekhar Mukharji

বিশ্বপ্রেম - Universal love তৃ, ৪৬-৪৮

Rajani Kanta Gupta

অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য—Application and Perseverance as illustrated in the lives of Newton, Benjamin Franklin, Raghunath and others চ, ১-৯

Krishna Behari Sen

মহাভিনিষ্ক্রমণ—The Great Renunciation of Buddha—his triumph over '*Mar*' তৃ, ৩৩-৩৭

৩। ইতি-কথা (Historical Sketches.)

৪। নিসর্গ-কথা (Natural Sceneries)

৫। গার্হস্থ্য-কথা (Domestic Scenes)

Iswar Chandra Vidyasagar

শকুন্তলাবিদায়—Sakuntala leaving the hermitage for her consort. প্র, ২ -৩৩

Ramesh Chandra Dutt

তালপুকুর—A village-scene at noon-tide— তৃ, ৩৮-৪০

৬। প্রাণি-কথা (Sketches from Natural History)

Nabin Krishna Banerji

পশুদিগের সংস্কার—Instincts of lower animals প্র, ৩৪-৪১

কীট—Wonders of Insect-life— প্র, ৪১৪৮

*   *   *

বহুরূপা—Chamelion— দ্বি, ১৪-১৬

*   *   *

শ্লথ—Sloth— চ, ১৪-১৭

-0-

৭। কাল্পনিক কথা (Scenes from Novels)

Bankim Chandra Chatterji

দেবমন্দির—A Chance-meeting at night of Joy Sing and Tilottama in a temple দ্বি, ৩৪-৩৯

সমুদ্রতটে—Nabakumar by the Sea-side—bewildered দ্বি, ৪০-৪৪

Ramesh Chandra Dutt

মহেশ্বর মন্দির—The temple of Moheswar— তৃ, ৪০-৪৩

৮। বিজ্ঞান-কথা (Scientific pieces)

৯। স্বাস্থ্য-কথা—(Hygienic pieces)

১০। আকাশ-কথা—(Astronomical pieces)

১১। পৌরাণিক কথা—(Pouranic scenes)

Binoy Kumar Mukherjee

সূচী

প্রথম খণ্ড

শকুন্তলাবিদায়-

পশুদিগের সংস্কার—

কীট—

সরস্বতী তীরে—

ক্রীট দ্বীপ—

ফর্দ্দুসী

দ্বিতীয় খণ্ড

অতিথিসেবা—

রোগীর সেবা—

বহুরূপা—

আমার বাল্যশিক্ষা—

চন্দ্রলোক—

গগনবিহার—

দেব-মন্দির—

চিতোর—

তৃতীয় খণ্ড

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র—

চতুর্থ খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

প্রবন্ধ-রত্ন

অক্ষয়কুমার দত্ত

Class No. 891'44
11138
Granthagar

পরিশ্রম

মনুষ্যেরা পশুপক্ষ্যাদি ইতরপ্রাণীর ন্যায় অযত্নসম্ভূত আচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগকে নিজযত্নে ঐ সমুদয় উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্যবস্তু সমুদায় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনুষ্য আপনার শরীর ও মন পরিচালন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ ও সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিবে। তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অনুমতি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

পরমেশ্বরের অভিপ্রায়

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন, কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকশিত পুষ্পপরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্তরঞ্জন পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, তড়িৎসম বেগবিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্মশাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকরস্বরূপ বিদ্যামন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টিস্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদায় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমাপক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

পরিশ্রমের মহত্ত্ব

পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলস্যের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে কেবল পরিণামেই সুখোৎপাদক এমন নহে, কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীরচালনায় যে কিরূপ দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না; গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিতে পারিলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা প্রতিদিবস সাত আট ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনাপরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়। শরীর সঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হইয়া ক্লেশভোগ করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে অঙ্গসঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গচালন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন।

শারীরিক শ্রমে সদ্য সুখ

শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক, নতুবা মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে; সুতরাং তেজস্বিনী মনোবৃত্তি পরিচালন দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে চকিত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-সলিলের এক একটি পবিত্র প্রস্রবণস্বরূপ। তাহাদিগকে যথাবিধানে চালন করিয়া যত সতেজ করা যায়, ততই প্রবল সুখধারা উৎপাদিত হইতে থাকে। অতএব পরিশ্রম যে আবশ্যক ও বিধেয়, ইহা আমাদিগের প্রকৃতিপটে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে।

মানসিক শ্রমের আবশ্যকতা

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, তাহারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম্ম ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিবেচনা করেন, আর অনাবশ্যক অলীক কার্য্য সমুদায় ভদ্রলোকের অনুষ্ঠানযোগ্য সুখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম ইতর বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পশুবধ করা সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত লোকের অযোগ্য বিবেচনা করেন না। 'ভদ্র' এই আখ্যাধারী মহাশয়েরা যৎসামান্য জলাশয়-তটে উপবিষ্ট ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া এবং দুঃসহ চাক-চিক্যময় জলপুঞ্জোপরি প্লবমান শ্বেতবর্ণ তরণ্ডের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া অশেষবিধ নিষ্ঠুরাচরণ সহকারে প্রাণিহিংসা করাকে আপনাদের উপযুক্ত কর্ম্ম বোধ করেন; কিন্তু জনসমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম্মসমুদায় কেবল কষ্টদায়ক নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন।

শারীরিক শ্রম নিন্দনীয় নহে

যে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাহাকে উচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতে দৃষ্টি করা যায়। আর যখন তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল প্রবল হইয়া উঠে, তখন পশুবৎ নিকৃষ্ট ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া নিকৃষ্ট জীবের ভাব গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু অবিবেচক অদূরদর্শী মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার, করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত নহে। যখন আমাদের লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোন ক্রমেই ঘৃণার বিষয় নহে। যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল তাহাই নিন্দনীয়—

নিয়মানুকূল ব্যবসায় নিন্দনীয় নহে

তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায়, আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না।

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরমপিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়, এবং অন্যের উপাসনা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হলচালনা করা দূষ্য নহে, করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে। এতদ্দেশীয় বিষয়ী লোক, যে সমস্ত ঔপাধিক-লাভদায়িকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধানবৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদায়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায়পথাশ্রয়ী সরল-স্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্র গুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দবিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্বরথ-শোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদশ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজুস্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলীপত্রস্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুলগ্রাস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণপাত্রারূঢ় সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহুকালাবধি এদেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে তাহারা ন্যায়বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবে, পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবে, অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবে, তথাচ ঈশ্বরানুমত, ধর্ম্মানুগত শিল্পকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবে না।

—পরন্তু, অতি প্রশংসনীয় ও পবিত্র

ন্যায় পথাশ্রয়ীর শ্রেষ্ঠতা

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখজনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক লোকে নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক

বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জনসমাজে এ বিষয়ে অতিশয় অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা প্রতি দিবস ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ দণ্ড কর্ম্ম করিয়া কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত করিতেছে, কেহ বা চারিদণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত নহে। কিন্তু এই উভয়ই অনিষ্টকর। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়; সুতরাং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকলও তেজোহীন হইতে থাকে। মনুষ্য কেবল এইরূপ করিয়া আয়ুক্ষয় করিবে, ইহা কদাচ পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তিনি আমাদিগকে নানা প্রকার শুভকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন; অতএব প্রতিদিবস তৎসমুদয় সঞ্চালন করিয়া শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিবসই জীবিকা-নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্টকাল জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পবিত্র প্রমোদ সম্ভোগে যাপন করা বিধেয়।

নিয়মিত শ্রম অল্প ও অধিক শ্রমের অপকারিতা

যে জনসমাজে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবিলাসী ব্যক্তিরা সংসারের কোন প্রকার উপকার না করিয়া স্তূপাকার ভোজ্যভোগ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন এবং নির্ধন লোক তাহাদের ইন্দ্রিয়সেবা সমাধার্থে প্রতিদিন ত্রিশ চল্লিশ দণ্ড পরিশ্রম করিয়া শরীরপাত করিতেছে, তাহার ব্যবস্থাপ্রণালীর কোন স্থানে না কোন স্থানে কোন প্রকার দোষ অবশ্যই প্রবিষ্ট আছে সন্দেহ নাই। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে কেবল ক্লেশ ও নিদ্রা এই দুই বিষয়েরই সেবা করে। তাহাদের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। অন্যান্য শিল্পযন্ত্রের ন্যায়, তাহাদিগকেও এক একটি যন্ত্র বলিলে বলা যায়। যদি জ্ঞানবৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি করাই

সামাজিক ব্যবস্থা প্রণালীর দোষ

মনুষ্যের প্রধান কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জনসমাজে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

আহার পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন কিঞ্চিৎকাল কর্ম্ম করা আবশ্যক বটে, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত, যে প্রমাণ ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয়, তাহা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না। মনুষ্যেরা আপনাদের অতি প্রবল ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ দ্রব্যও আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে। সেই সমুদায় আহরণার্থ ভোগাভিলাষীদিগকে অধিক অর্থব্যয় করিতে হয়। যদি লোকে ঐ সমস্ত নিষ্প্রয়োজন দ্রব্যলাভের অভিলাষ পরিত্যাগ করে এবং সকলে প্রতিদিবস ন্যূনাধিক এক প্রহর কাল পরিশ্রম করে, তাহা হইলে সুখস্বচ্ছন্দে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সর্ব্ববিধলোকের পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য

সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এবং যে সমস্ত জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা বিধেয়—এই কল্যাণকর নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়। জগৎপিতা জগদীশ্বর, যাবতীয় জন্তুকে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সামর্থ্য দিয়াছেন। সকল সিংহই, আপন আহার অন্বেষণ করে এবং প্রত্যেক বীবরই নিজ নিকেতন নির্ম্মাণ বিষয়ে সহায়তা করে। যে সকল জীব, শ্রেণীভুক্ত হইয়া এক এক শ্রেণী এক এক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে একটিও বিনা পরিশ্রমে কাল হরণ করে

পরিশ্রম সাহচর্য্যের আবশ্যকতা ও উদাহরণ

না ; সুতরাং অন্যদীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি মধ্বর্থ আহরণ করে, অপর কতক-গুলি মধুক্রম নির্ম্মাণ করে, অবশিষ্ট কতকগুলি মধু সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কিন্তু, কি দুঃখের বিষয়! মনুষ্যেরা এই সমস্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াও পরমেশ্বরের স্পষ্টাভিপ্রায় অবগত হয় না, এবং আপন প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য অবধারণ করে না।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, উল্লিখিত ভোগাভিলাষী মহাশয়দিগের এবং পরোপজীবী নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের পোষণার্থে অপর ব্যক্তিদিগকে তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। সকলেইস্ব স্ব ক্ষমতানু-রূপ কর্ম্ম করিলে, সকলের ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হলচালনা ও খনিত্র ব্যবহার না করিলে, সংসারের উপকার করা হয় না, এমত নহে। ধনশালী মহাশয়েরা আপনাদের অর্থব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের এই উভয় উপায় দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক।

প্রকার ভেদে পরিশ্রম আচরণীয়

কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম, উভয়ই হিতকারী। যাঁহারা বুদ্ধি-বলে নূতন শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত ও তৎসম্বন্ধীয় অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় মনুষ্য। যাঁহারা বাচনিক উপদেশ অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকের ভ্রম নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা ভূলোকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন ঊষাকালের সুকুমার

সংসারে কায়িক ও মানসিক শ্রম সমভাবে উপকারী

অরুণপ্রভা পূর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর পশ্চিমপ্রদেশে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত মহানুভব মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রভাব, ক্রমে ক্রমে দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া থাকে।

ধনশালীর শ্রমবিমুখতা-ইহার কুফল

ধনশালী মহাশয়েরা যে, স্বীয় ভোগাভিলাষ খর্ব্ব করিয়া জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না, এটি তাঁহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের অতিমাত্র উত্তেজনারই কার্য্য। ইহাকে তাঁহাদের অত্যন্ত অযশস্কর অধর্ম্মের মধ্যে গণিত করিতে হয়। তাঁহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিকট পরাভূত হইয়া রহিয়াছে। এদেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা, অনেকেই যাদৃশ অলীক ব্যাপারে অর্থব্যয় করেন, এবং যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা স্মরণ হইলে, দুঃসহ দুঃখতাপে তাপিত হইতে হয় এবং একবারে স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বজাতীয় লোককে ধিক্কার দিতে হয়।

উল্কাপিণ্ড

ইদানীং অনেকে মধ্যে মধ্যে অন্তরীক্ষ হইতে ধাতুপিণ্ডপাতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ধাতুপিণ্ড এই প্রস্তাবে উল্কাপিণ্ড বলিয়া লিখিত হইল। রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে নক্ষত্রপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বাস্তবিক উল্কাপাত, নক্ষত্রপাত নয়। এক একটি নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষাও কত লক্ষগুণ বৃহৎ তাহা বলা যায় না। সে সমুদয় পৃথিবীর উপর পতিত হইলে, পৃথিবীর প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়। উল্কাপিণ্ড পতিত বা চালিত হইবার সময়ে নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হয়।

উল্কাপিণ্ড ও উল্কাপাত

১৭৭২ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণে দিবা দ্বিপ্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়, তাহা কলিকাতায় আসিয়াটিক সোসাইটি নামক সমাজের চিত্রশালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে কত স্থানে ঐরূপ কত উল্কাপিণ্ড পতিত হয়, তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। এক এক দিন লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড আকাশমণ্ডলে আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে।

বিষ্ণুপুরের উল্কাপিণ্ড

ঐ সমস্ত উল্কাপিণ্ড পতিত হইবার সময়ে অন্তরীক্ষে একটা সুদীর্ঘ অগ্নিশিখা চলিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ একটা মহাশব্দ উৎপন্ন হয়। কখন কখন এপ্রকার ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপাদিত হইয়া থাকে যে, ঘর, দ্বার, প্রাচীর প্রভৃতি কম্পিত হইয়া উঠে।

উল্কাপিণ্ডের পতনধ্বনি

ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের নিকট যে উল্কাপিণ্ড পতিত হইবার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা পতিত হইবার সময়ে কামানের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। কখন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অকস্মাৎ একখানি ঘোরতর মেঘ উপস্থিত হইয়া অতি গভীর শব্দপরম্পরা উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক উল্কাপিণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। এক এক সময়ে ঐরূপ মেঘ হইতে সহস্র সহস্র উল্কাপিণ্ড পতিত হইতে দৃষ্টি করা গিয়াছে।

উল্কাপাতের সময়ে শিখা দেখা যায় ও শব্দ হইয়া থাকে, ইহা বহু কালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নভোমণ্ডল হইতে যে স্থূলাকার উল্কাপিণ্ড পতিত হয়, ইহা সেরূপ প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইহা পতিত হইবার সময়ে উষ্ণ থাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর ফরাশিশ দেশে উল্কাপাত হইয়া একটি শস্যাগার একবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

উল্কাপিণ্ডের দাহিকাশক্তি

রাত্রিকালে অগ্নিশিখার ন্যায় পতিত হউক, আর দিবাভাগে দীপ্তিশূন্য হইয়াই বা বর্ষিত হউক, সমুদায় উল্কাপিণ্ড একরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ। লৌহ, তাম্র, টিন, গন্ধক, নিকল, কোবাল্ট, সোডা প্রভৃতি ত্রয়োদশটি পার্থিব বস্তু উল্কাপিণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই, সে বস্তু উহাতে দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীতে খনির মধ্যে বিশুদ্ধ লৌহ ও বিশুদ্ধ নিকল ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহাদের সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু উল্কাপিণ্ডে যে লৌহ ও নিকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ। তাহার সহিত অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, উল্কাপিণ্ড পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা পৃথিব্যাদি গ্রহগণের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল

যাবতীয় উল্কাপিণ্ডের উপকরণ এক—তন্নির্দ্দেশ

প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে। পৃথিবীমণ্ডলে যে সমুদায় পদার্থ আছে, যখন উল্কাপিণ্ডেও কেবল তাহারই কোন কোন পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তখন গ্রহ ও উপগ্রহগণও পার্থিব পদার্থে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে।

উল্কাপিণ্ডের বিভিন্ন আয়তন

সকল উল্কাপিণ্ড সমানরূপ বৃহৎ নয়। ছোট বড় নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ব্রেজিল রাজ্যের অন্তঃপাতী বেহিয়া নামক স্থানে একটা উল্কাপিণ্ড পতিত আছে, তাহার ব্যাস ন্যূনাধিক পাঁচ হস্ত হইবে। লিখিত আছে, গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটিস্ যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর সে দেশের ইগস্ পোটেমস্ নামক নগরে এক বৃহৎ উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। তাহা এত বৃহৎ যে একখানি শকট তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বোঝাই হইতে পারে। খৃষ্টীয় শকের দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে নাণি নামক নগরের নিকটবর্ত্তিনী নদীতে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়; উহা এত বৃহৎ যে, জলের উপর চারিফুট জাগিয়াছিল। মোগলজাতির মধ্যে এরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে, চীনরাজ্যের পশ্চিমখণ্ডে হরিন্নদীর প্রস্রবণ সন্নিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ উল্কাপিণ্ডের কিয়দংশ পতিত আছে, সেই পিণ্ড সাতাইশ হস্ত উচ্চ!

উল্কাপিণ্ড চতুর্দ্দিকে যে দাহ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা লইয়া পরিমাণ করিলে উহা অতি বৃহৎ বলিতে হয়। কোন কোনটার

— উহার ব্যাস

ব্যাস পাঁচ শত ফুট, কোন কোনটার বা এক সহস্র ফুট, কোন কোনটার ব্যাস তদপেক্ষাও অধিক দেখা গিয়াছে। সর্ চার্লস ব্লাগডেন নামক ইউরোপীয় পণ্ডিত ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারীতে একটা উল্কা দৃষ্টি করেন, তাহার ব্যাস দুই হাজার ছয় শত ফুট হইবে।

সৌরজগতে কত কোটি উল্কাপিণ্ড নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। মধ্যে মধ্যে একেবারে এত উল্কাপাত হয় যে, তাহা দেখিলে ও শুনিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিতে হয়। আরবীয় ইতিহাসবেত্তারা বর্ণন করিয়াছেন, যে রাত্রে ইব্রাহিম বেন্ আম্মাদ নামক নরপতি প্রাণত্যাগ করেন, সেই রাত্রে বহুসংখ্যক নক্ষত্র পতিত হয়। ঐ নক্ষত্রপাত অগ্নিবৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা গ্রন্থবিশেষে মধ্যে মধ্যে যে অগ্নিবর্ষণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ঐরূপ কোন উল্কাপাত দৃষ্টে উদ্বোধিত হইয়াছে বোধ হয়। এরূপ ইতিহাস আছে, ১০৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রেল ফরাশিদিগের দেশে শিলাবৃষ্টির ন্যায় নক্ষত্র বৃষ্টি হইয়াছিল। ঐরূপ লিখিত আছে, ১২০২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবরের সমস্ত রাত্রি শলভবর্ষণের ন্যায় নক্ষত্র বর্ষণ হইয়াছিল। ১৩৬৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবরে রাত্রিশেষে একেবারে এত নক্ষত্রপাত হয় যে, কেহই তাহা গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই।'

উল্কাপিণ্ড অসংখ্য

অগ্নিবর্ষণ উল্কাপাত

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বরে আমেরিকা হইতে যে অদ্ভুত উল্কাপুঞ্জের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। ঐ দিবস রাত্রি নয় ঘণ্টা অবধি পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। অগ্নিক্রীড়ার নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য উল্কাপিণ্ড আবির্ভূত হইয়া চক্ষুর্গোচর সমস্ত নভঃপ্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে সমুদায় যতক্ষণ অতিশয় অবিরল দৃষ্ট হইয়াছিল, ততক্ষণ কাহারও গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। অনন্তর যখন কিছু বিরল হইয়া আসিল তখন বোষ্টন নগরস্থ এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি ঘণ্টায়

বিস্ময়কর উল্কাপুঞ্জের আবির্ভাব

চল্লিশ সহস্র উল্কাপিণ্ড আবির্ভূত ও চালিত হইতেছে। ক্রমাগত সাত ঘণ্টা এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বলিতে হয়, দুই লক্ষ অশীতি সহস্র উল্কাপিণ্ড ঐ রজনীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সময় উল্কার সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে তদপেক্ষায় অধিক সংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, রজনীতে সৌরজগতের অন্তর্গত তিন লক্ষ জড়ময় উল্কাপিণ্ড আমেরিকার ঊর্দ্ধদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বপতির বিশ্বভাণ্ডারে কত অদ্ভুত বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কেবল কয়েকটি গ্রহ, চন্দ্র ও ধূমকেতু মাত্রই সৌরজগতে বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অসংখ্য উল্কাপিণ্ড যে তাহার অন্তর্গত থাকিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের স্বপ্নেরও গোচর ছিল না।

উল্কাপিণ্ডের গতির বিষয় বিবেচনা করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ কোন বস্তুর তাদৃশ সত্বর গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে দুইটি উল্কাপিণ্ডের বেগ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে একটির গতি প্রতি পলে এক শত চৌষট্টি ক্রোশ, দ্বিতীয়টির বেগ প্রতি পলে এক শত উনআশি ক্রোশের ন্যূন ও দুই শত বাইশ ক্রোশের অধিক নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ দুইটির মধ্যে একটি ভূতলের দিকে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সাতাইশটি উল্কাপিণ্ডের গতি ও পথ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে একএকটির বেগ প্রতিপলে তিনশত আশি ক্রোশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সুইজর্লণ্ড দেশে অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড

উল্কাপিণ্ডের গতি ও পথ

পর্য্যবেক্ষিত হয়। তাহাদের বেগ প্রতি পলে গড়ে দুই হাজার তিন শত তেইশ ক্রোশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহগণের গতির সহিত তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐ সকল উল্কাপিণ্ড বুধ গ্রহ অপেক্ষা সাড়ে সাত গুণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা এগারগুণ প্রবলতর বেগে পরিভ্রমণ করে। অনেকানেক ধূমকেতুও উক্তরূপ সত্বরগামী নয়।

ঐ সমস্ত উল্কাপিণ্ড ভূমণ্ডল হইতে কত ঊর্দ্ধে উদিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যত্ন ও অনেক আয়াস পাইয়াছেন এবং গণনা করিয়া কতকগুলির উৎসেধাঙ্ক নির্দ্ধারণও করিয়াছেন। এবিষয়ে অতিমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটার উৎসেধ তিন ক্রোশ, কোনটার বা সত্তর ক্রোশ, কোনটার বা একশত চল্লিশ ক্রোশ, কোনটার বা দুইশত ত্রিশ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ড দেশে যে সমস্ত উল্কাপিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহাদের উৎসেধ দুইশত পঁচাত্তর ক্রোশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

উল্কাপিণ্ডের উদয়স্থল

কখন কখন উল্কাপাতের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার শিখা আবির্ভূত হইবামাত্র অমনি তিরোহিত হয়। কিন্তু কোন কোন উল্কাপিণ্ডের শিখা সত্তর, পঁচিশ ও সাঁইত্রিশ পল পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কোন রণপোতাধ্যক্ষ অর্ণবযান আরোহণ করিয়া ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক স্থানে একটি উল্কাপিণ্ড দৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই উল্কাপিণ্ড তিরোহিত হইবার পর তাহার শিখা এক ঘণ্টা স্থির হইয়াছিল। নভোমণ্ডলের যে অংশে পৃথিবীর ছায়া পতিত হয়, যখন সেই অংশে ঐ ছায়ার মধ্যেও উল্কার আভা দৃষ্ট হয়, তখন ঐ আলোক উহার নিজের আলোক বই আর কি বলিতে পারা যায়? গ্রহচন্দ্রাদি যেমন

উল্কাপিণ্ডের শিখা

সূর্য্যের তেজ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তেজোময় দেখায়, উল্কাপিণ্ড সেরূপ বোধ হয় না।

উল্কাপিণ্ড কিরূপে কোথা হইতে পতিত হয়, এই বিষয় লইয়া পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি, পতনের কাল ও হেতু

কেহ কহিতেন, উহা বায়ু-মধ্যস্থিত বস্তুবিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়। কেহ বলিতেন, উহা আগ্নেয়-গিরি হইতে নির্গত হইয়া থাকে। কেহ বা উহা চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ইদানীন্তন পণ্ডিতবর্গ উল্লিখিত অভিপ্রায়ত্রয় নিরাকরণ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রহ ও ধূমকেতু সমুদায় যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, ঐ সমুদায় উল্কাপিণ্ড সেইরূপ নিয়মাবদ্ধ থাকিয়া সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভূমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তৎকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৎসরের মধ্যে এক এক সময়ে অধিকসংখ্যক উল্কাপিণ্ড দৃষ্টি-গোচর হয়। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহারা নভোমণ্ডলের যে প্রদেশ দিয়া ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেই সেই সময়ে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, পৃথিবীস্থ লোকেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে দেখিতে পায়।

উল্কাপিণ্ড আবির্ভাবের বিশিষ্ট কাল নির্দ্দেশ

৮ই আগষ্ট অবধি ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এবং ৬ই নভেম্বর অবধি ১৯শে নভেম্বর পর্য্যন্তই অধিক উল্কা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নভেম্বর মাসের ১২ই ও ১৩ই তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক উল্কাপিণ্ড আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

ইদানীন্তন অনেকানেক প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা

করেন, চন্দ্র যেমন নিরূপিত সময়ের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতক উল্কাপিণ্ড কালক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, যথানিয়মে উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফরাশিশ্ রাজ্যের অন্তঃপাতী তুলুস্ নগরস্থ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐরূপ একটি বৃহত্তর উল্কাপিণ্ড ধরাতল হইতে দুই সহস্র দুইশত ক্রোশ ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া আট দণ্ড কুড়ি পলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। সুতরাং বলিতে হয়, উহা পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রায় সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

উল্কাপিণ্ডের ভূ-প্রদক্ষিণ

১৮৬২ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যে সমস্ত ধূমকেতু দৃষ্ট হয় এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের ভ্রমণপথের মধ্যে থাকিয়া যে সমুদায় কনিষ্ঠ গ্রহ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, সে সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ উল্কাপিণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শনিগ্রহের বলয়ও এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড-বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

—ও সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ
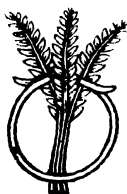
রামায়ণ গান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[অযোধ্যাধিপতি রাজা রামচন্দ্র, লোকরঞ্জনানুরোধে নিষ্কলঙ্কা সতীশিরোমণি সীতা দেবীর বৃথা অপবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বনবাস আদেশ প্রদান করিলে, লক্ষ্মণ বাল্মীকি ঋষির তপোবনে, গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়া আসেন। সীতা একাকী ক্রন্দন করিতে থাকিলে ঋষিকুমারগণ এবং তৎপরে বাল্মীকি ঋষি স্বয়ং আগমন করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। তথায় সীতা দেবী লব ও কুশ নামক যমজ কুমার প্রসব করিলেন। বাল্মীকি ঋষি, কুমারযুগলকে স্বরচিত রামায়ণ গান করিতে শিক্ষা প্রদান করেন। তদনন্তর রামচন্দ্র নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিয়া মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিরাট আয়োজন করিলে, মহর্ষি বাল্মীকি সেই যজ্ঞ দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া লব ও কুশ সমভিব্যাহারে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিষ্কলঙ্কা সীতার পুনঃ পরিগ্রহের উপায় চিন্তা করিয়া শেষে তিনি লব ও কুশ কর্ত্তৃক স্বরচিত রামচরিত গান করাইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা করিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি, রামচন্দ্রের যজ্ঞসভায় লব ও কুশের রামায়ণ গানের চিত্র।]

একদিন, মহর্ষি বাল্মীকি বিরলে বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া এতদিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম, এ পর্য্যন্ত অভিপ্রেত সাধনের কোন উপায় নিরূপণ করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি? একবারেই উহাদের দুই সহোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায় লইয়া যাই, অথবা রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই, এবং বিরলে সকল বিষয় সবিশেষ কহিয়া এবং কুশ ও লবকে দেখাইয়া সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। মনে মনে এইরূপ বিবিধ বিতর্ক করিয়া পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, কুশ ও লবকে রামায়ণ গান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিলে, ক্রমে ক্রমে রাজার গোচর হইবেক; তখন, তিনি অবশ্যই স্বীয় চরিত শ্রবণমানসে উহাদিগকে স্বসমীপে আহ্বান করিবেন, এবং তাহা হইলেই বিনা প্রার্থনায় আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে।

বাল্মীকি ঋষির রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা পরিগ্রহের উপায় চিন্তা ও নির্দ্দেশ—রামায়ণ গান

এই সিদ্ধান্ত করিয়া মহর্ষি, কুশ ও লবকে স্বসমীপে আহ্বান করিলেন, এবং কহিলেন—"বৎস কুশ! বৎস লব! তোমরা প্রতিদিন সময়ে সময়ে সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে, এবং সভাভবনের অভিমুখভাগে মনের অনুরাগে বীণাসংযোগে রামায়ণ গান করিবে। যদি রাজা, পরম্পরায় অবগত হইয়া, তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান

বাল্মীকির লব ও কুশের প্রতি রামায়ণ গান করিবার আদেশ ও তদ্বিষয়ক উপদেশ

করিতে আরম্ভ করিবে। আর যতক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোন প্রকার ধৃষ্টতা বা অশিষ্টতা প্রদর্শন করিবে না। রাজা সকলের পিতা, অতএব তোমরা তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিবে। যদি সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত হইয়া রাজা অর্থ প্রদানে উদ্যত হন, লোভপরবশ হইয়া তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না, বিনয় ও ভক্তি সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া ধনগ্রহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিবে; কহিবে,—'মহারাজ! আমরা বনবাসী, আমাদের ধনে প্রয়োজন কি, তপোবনে থাকিয়া ফল মূল দ্বারা প্রাণধারণ করি। আর যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কহিবে,—'আমরা বাল্মীকি-শিষ্য"।

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন এবং তাহারাও দুই সহোদরে, তদীয় আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, বীণাসহযোগে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিল। যে সঙ্গীত শ্রবণ করিল, সেই মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ, রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী; তৃতীয়তঃ, কুশ ও লবের রূপমাধুরী দর্শন করিলেই মোহিত হইতে হয়, তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে, উহার সহিত তুলনা করিলে কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়; চতুর্থতঃ, বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদায়ের সমাবেশ আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপূর্ণ না হইবে?

লব ও কুশ কর্তৃক সুমধুর রামায়ণ গান আরম্ভ

কিয়ৎকাল পরেই, অনেকেই রামের নিকটে গিয়া কহিতে

লাগিলেন,—'মহারাজ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার বীণাযন্ত্র সহযোগে আপনার চরিত্র গান করিতেছে; যে শুনিতেছে সেই মোহিত হইতেছে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন এমন মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ! মানবদেহে কেহ কখন এমন রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক কি কহিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভব স্বীকার করিবে; আর, তাহারা যে কাব্য গান করিতেছে, তাহা কাহার রচনা বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব ললিত রচনা কখন শ্রবণ করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া আপনকার সমক্ষে সঙ্গীত করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে ও তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই'।

রামচন্দ্র সমীপে লব কুশ ও গানের প্রশংসা

শ্রবণমাত্র রামের অন্তঃকরণে প্রভূত কৌতূহলরসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহাদের দুই সহোদরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা, রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া বিলম্ব ব্যতিরেকে, অতি বিনীতভাবে সভায় প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস অথবা বিষাদবিষ সহসা সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইল, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, সেই দুই কুমারকে নিস্পন্দ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন।

রাজসভায় লব ও কুশের আগমন ও রামচন্দ্রের ভাবাবেশ

কুমারেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া যথোচিত বিনয় ও ভক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ! আমাদিগকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন'? তাহারা সন্নিহিত হইলে, রাম তদীয় কলেবরে আপনার ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন। কিন্তু তৎকালে রাজসভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, এই নিমিত্ত অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্য সংবরণ করিয়া, সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন,—'শুনিলাম তোমরা অপূর্ব্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মোহিত হইয়া প্রশংসা করিতেছেন। এ জন্য আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিঞ্চিৎ গান করিয়া আমাকে প্রীতি প্রদান কর'। তাহারা কহিল—'মহারাজ! আমরা যে কাব্য গান করিয়া থাকি, তাহা অতি বিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের চরিত্র সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আপনকার সমক্ষে ঐ কাব্যের কোন্ অংশ গান করিব, আদেশ করুন।'

রামচন্দ্রের চিত্ত-চাঞ্চল্য ও গান করিবার আদেশ প্রদান

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত এত চঞ্চল ও সীতাশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোক-লজ্জাভয়ে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া বিজন প্রদেশে সেবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। এজন্য কহিলেন,—'অদ্য তোমরা নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ যে কোন অংশ গান কর, কল্য প্রভাত অবধি প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া তোমাদের মুখে

গান আরম্ভ

২৩৮

সমুদয় কাব্য শ্রবণ করিব। তাহারা, 'যে আজ্ঞা মহারাজ'! বলিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া মুক্ত-কণ্ঠে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন—'এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছ'? তাহারা কহিল—'মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকি-রচিত; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকটেই সমুদয় শিক্ষা করিয়াছি'। তখন রাম কহিলেন, 'ভগবান্ বাল্মীকি স্বচরিত কাব্যে অতি অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। কিন্তু অদ্য তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, আর তোমাদিগকে অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; আজি তোমরা আবাসে গমন কর।

এই বলিয়া তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় করিয়া, রাম সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন, এবং আপন বাসভবনে প্রবেশ করিয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই দুই কুমারকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তানকে দেখিলে, লোকের চিত্তে যে রূপ স্নেহ ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই, আমারও ইহা-দিগকে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার। আর যদিই বা ঋষি-কুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি? আমি যে অবস্থায় প্রিয়াকে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি

রামচন্দ্রের মনে দ্বিধা ও নৈরাশ্য

দুঃসহ শোকে ও দুরপনেয় অপমান ভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোন দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে তেমন অবস্থায়, প্রাণধারণে সমর্থা হইয়া নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালনপালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। আমি যে রূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না।

এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—'কিন্তু উহাদের আকার প্রকার দেখিলে ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে; অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। দেখিলেই আমার প্রতিরূপ বলিয়া বিলক্ষণ বোধ হয়। আর অভিনিবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলে, সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িতরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, চিবুক, ওষ্ঠ, ও দন্তপংক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি কেবল অনিমিত্তঘটনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? আর ইহারা কহিল, বাল্মীকিতপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে। আমিও লক্ষ্মণকে সীতারে বাল্মীকিতপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কহিয়াছিলাম। হয় ত, মহর্ষি কারুণ্যবশতঃ সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, তথায় তিনি এই দুই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া সকলে এরূপ সম্ভাবনা করিতেন যে, জানকী গর্ভযুগল ধারণ করিয়াছেন। এ সকল আলোচনা করিলে, আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা আমি মৃগতৃষ্ণি-

অবয়বগত সাদৃশ্য দেখিয়া আশার উন্মেষ

কায় ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি নৃশংস রাক্ষসের ন্যায়, নিতান্ত নির্দ্দয় ও নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীকে সম্পূর্ণ নিরপরাধে বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। হা প্রিয়ে! তুমি, তেমনই সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া কেন এমন দুঃশীলের ও ক্রূরহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে! আমি যখন তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিযাও অনায়াসে বনবাস দিতে ও বনবাস দিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে'?

এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে, দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া রাম বিচেতনপ্রায় হইলে, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারি
ক্ষীণ আশার বিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ
দ্রুত পরিপুষ্টি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—'বাল্মীকি সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সীতা তথায় এই দুই যমজ তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্প দিন মাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক নহে; বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে, এ বয়সে উপনয়ন হইবে কেন? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অষ্টম বর্ষে উহাদের সংস্কার সম্পাদন করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত, উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের

বেশ সর্ব্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়-কুমার হয়, তাহা হইলে ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না। কারণ, অন্য ক্ষত্রিয় সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা কি? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না'।

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া রাম কহিতে লাগিলেন—'যদি প্রিয়া এপর্য্যন্ত জীবিতা থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়! প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও আমার সর্ব্বশরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়' এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন,—'এই দীর্ঘ বিয়োগের পর যখন প্রথম সমাগম হইবে, তখন বোধ হয় আমি আহ্লাদে অধৈর্য্য হইব; প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম সমাগমক্ষণে উভয়েরই আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবলবেগে বাহিত হইতে থাকিবে'। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া হর্ষবাষ্প বিসর্জ্জন করিলেন। পরক্ষণেই এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে, কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইব। অথবা তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র, তাঁহার চরণ ধরিয়া বিনয় বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিব'। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে,—'পাছে প্রজালোকে ঘৃণা ও

সীতার সহিত পুনর্ম্মিলনের সুখচ্ছবি

বিরাগ প্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়াকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি ; এক্ষণে যদি তাঁহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এতকাল আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহযাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।'

এই বলিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাম কিয়ৎক্ষণ অবসন্নমনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, সহসা উদ্ভূত রোষাবেশসহকারে কহিতে লাগিলেন,—'আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থা স্থাপন করিব না। অতঃপর প্রিয়াকে গ্রহণ করিলে যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক, আর আমি তাহাদের ছন্দানুবর্ত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। প্রথমেই প্রিয়াকে বনবাস দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাহাকে গ্রহণ করিব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়াবিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা তাহার সমভিব্যাহারে বনবাস, আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই'

সীতার পুনঃ পরিগ্রহে রামচন্দ্রের সঙ্কল্প

রাম, আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক, এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রজনী যাপন করিলেন।

শকুন্তলা বিদায়

[হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়ায় গিয়া মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতি কালে, তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিতা মেনকা-তনয়া শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুকাল শকুন্তলার সহিত অতিবাহিত করিয়া তিনি স্বীয় রাজধানী প্রত্যাবর্তন করেন এবং দুর্বাসা ঋষির অভিসম্পাতে, শকুন্তলার বিষয় একবারে বিস্মৃত হন— পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত শকুন্তলাকে রাজ অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার কথা তাঁহার আদৌ মনে রাহল না। মহর্ষি কণ্ব তপোবনে প্রত্যাগমন করিয়া শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই দিনই তাঁহাকে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক দুই শিষ্য ও ভগিনী গৌতমী সমভিব্যাহারে দুষ্মন্তসমীপে প্রেরণ করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালের বিদায়-চিত্র]

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত যাত্রাকাল— প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব কণ্বের স্নেহ বেশভূষা সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—'অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য, আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়া থাকে! বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু'! পরে, শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন,—'বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর,

আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন'? এই বলিয়া তপোবন-তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না. যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন. তোমরা অনুমতি কর।'

সখীসমীপে শকুন্তলা

অনন্তর. সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা. গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ম্বদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন.—'সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না'. প্রিয়ম্বদা কহিলেন—'সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতরা হইতেছ এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইয়াছে দেখ! সচেতন জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে, কোকিল কোকিলাগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে, মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিতেছে'।

তরুলতার নিকট বিদায়

কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়'। তখন শকুন্তলা কহিলেন—'তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না'। এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন—'বনতোষিণি! শাখা-

বাহুদ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম'। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন—'সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম'. তাঁহারা কহিলেন—'সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে অর্পণ করিলে বল'? এই বলিয়া শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন—'অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে. না, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে'!

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন—'তাত! এই হরিণীর নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিতে ভুলিবে না, বল'? কণ্ব কহিলেন—'না বৎসে'! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।'।

পশুর নিকট বিদায়

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা. 'আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে', এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে. যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগদ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীণ হরিণশিশু. তোমার গমন রোধ করিতেছে'। শকুন্তলা. তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন—'বাছা! আর আমার সঙ্গে কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম—

অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন'। এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন, তখন কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সম্বরণ কর; পথ দেখিয়া চল, উচ্চনীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারম্বার আঘাত লাগিতেছে'।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'ভগবন্! আপনার আর অধিকদূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থানেই যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন'। কণ্ব কহিলেন—'তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই'! অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন—''বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে,—'আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আর শকুন্তলা বন্ধুগণের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতে স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়''।

দুষ্মন্তের প্রতি কণ্বের সন্দেশ

কণ্ব, *শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে* সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি, কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ

শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশ

দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না. স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না, মহিলারা এইরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপা'। ইহা কহিয়া বলিলেন—'দেখ, গোতমীই বা কি বলেন'? গোতমী কহিলেন—'বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক'? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন—'বাছা। উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও'।

এইরূপে উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন—'বৎসে! আমরা আর অধিকদূর যাইব না। আমাকে ও সখীগণকে আলিঙ্গন কর'। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন—'অনসূয়া প্রিয়ম্বদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক'।

শকুন্তলার সহযাত্রী

কণ্ব কহিলেন—'না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গোতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন'। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিলেন—'তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব'—এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন—'বৎসে! এত কাতরা হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না'। শকুন্তলা পিতার চরণে পতিতা হইয়া কহিলেন—'তাত! আবার কতদিনে এই তপোবনে আসিব'? কণ্ব কহিলেন—'বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত

ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া পতি-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে'।

তপোবনে পুনরাগমনের ভাবী চিত্র

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী কহিলেন,—'বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার সময় বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয়, কহিয়া লও, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না'। তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন—'সখি! তোমরা উভয়ে এককালে আলিঙ্গন কর'। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিনজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন—'সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও'। শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন—'সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন বল? আমার হৃৎকম্প হইতেছে'। সখীরা কহিলেন—'না সখি, ভীতা হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে'।

সখীদিগের নিকট শেষ বিদায়, অঙ্গুরীয় প্রদান

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শকুন্তলা গোতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্যন্ত-রাজধানী প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূতা হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—'অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন কর'। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং

শকুন্তলার প্রস্থান ও কণ্বের প্রত্যাগমন

তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—'যেমন স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম'।

পশুদিগের সংস্কার

যে শক্তি দ্বারা পক্ষিজাতি নীড় নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়, মধুমক্ষিকাদিগের যে শক্তি থাকাতে তাহারা আশ্চর্য্য মধুক্রম প্রস্তুত করিতে পারে এবং উষ্ট্রের যে শক্তি থাকাতে উহারা বহুদূর হইতে নদনদী প্রভৃতি জলাশয় জানিতে পারে, সামান্যতঃ সেই শক্তিকেই পণ্ডিতগণ 'সংস্কার' কহিয়া থাকেন। পশুদিগের উক্ত 'সংস্কার' অতি অদ্ভুত সৃষ্টি; উহা কোন কালেও পরিবর্ত্তিত বা উন্নত হইবার নহে, চিরদিন সমভাবে থাকে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে জাতীয় পশুকে যে প্রকার কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে, শতবর্ষ পরেও সে পশুকে সেইরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়। উক্ত সংস্কারপ্রভাবে এক এক পশু এমন এক এক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে যে, মনুষ্য শতবর্ষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

পশ্বাদির সংস্কার অপরিবর্ত্তনীয়, সংস্কারজাত অদ্ভুত কৌশল

আমেরিকাদেশীয় বীবর নামক পশুর বাসস্থান নির্ম্মাণপ্রণালী যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, বা গ্রন্থাদিমধ্যে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকেই চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। উহারা যেরূপ অসাধারণ কৌশলপূর্ব্বক আপনাদিগের আবাসগৃহ প্রস্তুত করে, তাহা নানা পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জল-মার্জ্জারদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উহারা আপনাদিগের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে যে প্রকার কৌশল প্রকাশ করে, বিশেষ বুদ্ধিমান্ লোকেও হঠাৎ সে প্রকার

—তদ্দৃষ্টান্ত (১) বীবর (২) জলমার্জ্জার

শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। উহারা নদনদী প্রভৃতি কোন জলাশয়ের তীরে মৃত্তিকার নিম্নে গহ্বর করিয়া আপনাদিগের আবাসস্থান প্রস্তুত করে এবং নদনদী প্রভৃতির জলমগ্ন তটস্থ ভূমিতে ছিদ্র করিয়া ঐ বাসস্থানে যাতায়াত করিবার পথ প্রস্তুত করে। উহারা আপনাদিগের বাসস্থানে প্রবেশ করণার্থ জলমধ্যে যে রন্ধ্র প্রস্তুত করে, তাহা উক্ত জলাশয়ের তল হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে চালিত হইয়া ঐ বাসস্থানের সহিত মিলিত হয়। জল-মার্জ্জারদিগের বাস-গহ্বরের মধ্যে তিন চারিটি পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ থাকে এবং উহারা সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠ জলাশয়ের গর্ভ হইতে এত ঊর্দ্ধদেশে নির্ম্মাণ করে যে, তন্নিকটস্থ জলাশয়ের জল অপেক্ষাকৃত সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও তাহা প্লাবিত হইতে পারে না।

মারমট নামক জন্তুদিগের আবাসনির্ম্মাণবিষয়েও বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। উক্ত জন্তুগণ পর্ব্বত বা গিরিতলে মৃত্তিকার নিম্নে কিয়দ্দূর অন্তর করিয়া দুইটি পৃথক্ ছিদ্র নির্ম্মাণ করিয়া আইসে এবং তাহা ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ বক্রভাবে চালিত করিয়া উভয় ছিদ্রের মুখ একত্র মিলিত করে। যে স্থানে এই উভয় ছিদ্রের মুখ আসিয়া পরস্পর মিলিত হয়, সেই স্থানে তাহারা বাসোপযোগী সমতলবিশিষ্ট একটি মূল গহ্বর নির্ম্মাণ করে। ঐ গহ্বর-তলে উহারা তৃণ ও শৈবাল দ্বারা অপূর্ব্ব কোমল শয্যা বিস্তার করে। উল্লিখিত ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যে একটি দ্বারা উহারা আপনাদিগের বাসস্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে এবং আর একটির মধ্যে উহারা মল মূত্রাদি ত্যাজ্য বস্তু পরিত্যাগ করে। উক্ত প্রকার এক একটি বাসগৃহের মধ্যে কতিপয় মারমট একত্র বাস করে। এবং উহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টাদ্বারা ঐ

মারমট

বাসগৃহের সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। শীত ঋতুর উপক্রম দেখিয়াই উহারা আপনাদিগের বাসগৃহের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত সেই গহ্বরে নিদ্রিত থাকে।

(৪ বাবুই

এতদ্দেশীয় বাবুই নামক পক্ষীর বাসা অনেকেই সন্দর্শন করিয়াছেন। উক্ত পক্ষিসকল আপনাদিগের নীড়নির্ম্মাণবিষয়ে যে অনুপম কৌশল প্রকাশ করে, মহা মহা শিল্পনিপুণ বিচক্ষণ লোকেরাও তাহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। উহারা যে কিরূপ কৌশলদ্বারা অতি সূক্ষ্ম তৃণ পর্ণাদি একত্র সংযুক্ত করিয়া এ প্রকার অপূর্ব্ব নীড় প্রস্তুত করে, তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য হয় না। উহাদিগের নীড়ের সন্ধিস্থানে গ্রন্থি, কি কোন প্রকার বৃক্ষনির্য্যাসাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না, অথচ ঐ নীড়ের পৃথক্ পৃথক তৃণসকল পরস্পর এ প্রকার দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে যে, সামান্য বলদ্বারা ঐ নীড় ছিন্ন করা যায় না।

আয়তনানুযায়ী নীড় নির্ম্মাণ, সংস্কারজাত সতর্কতা

প্রত্যেক পক্ষীই আপনার শরীরের আয়তন ও শাবকের সংখ্যানুসারে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সারস ও শকুনি প্রভৃতি যে সকল পক্ষীর শরীর বৃহৎ এবং যে সমস্ত পক্ষী এককালে অধিক ডিম্ব প্রসব করে, তাহারা সচরাচর উচ্চ ও প্রশস্ত নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এবং চাতক ও খঞ্জন প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষিগণকে সর্ব্বদা অপ্রশস্ত ও অনুন্নত নীড় প্রস্তুত করিতে দেখা যায়।

সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগালাদি বিবরবাসী জন্তুগণ বিশেষ কৌশলপূর্ব্বক আপনাদিগের আকার প্রকার ও সুখস্বচ্ছন্দতার উপযোগী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কদাপি শৃগালের গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ

করিয়া তাহার অনিষ্টসাধন করিতে পারে না এবং শৃগালও কখন পক্ষীর নীড় আক্রমণ করিয়া তাহার হানি জন্মাইতে পারে না। জগদীশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু-দিগকে উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করিবার এই অসাধারণ শক্তি প্রদান করাতেই, এক পর্ব্বত ও এক অরণ্য মধ্যে করী, সিংহ, হরিণী, ব্যাঘ্র ও অহি নকুল প্রভৃতি খাদ্যখাদক সম্বন্ধবিশিষ্ট পশুগণ পরস্পর নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিতেছে।

বিবরবাসা জন্তুর কৌশল

পশুপক্ষীদিগের বাসস্থাননির্ম্মাণবিষয়ে যেমন অদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ অপরাপর নানাবিধ আশ্চর্য্য কৌশলদ্বারা উহারা আত্মরক্ষা ও সন্তান পালন করিয়া থাকে। যে বনে মর্কটাদির অধিক দৌরাত্ম্য, সে বন-মধ্যে পক্ষিগণ নীড় নিম্মাণ করিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করে। যে সকল পক্ষী অন্যান্য বনমধ্যে প্রকাশ্যস্থানে নীড় নিম্মাণ করিয়া থাকে, উক্ত বনমধ্যে তাহারা আর সে প্রকার না করিয়া অতি গুপ্তস্থানে বাসস্থান প্রস্তুত করে। পক্ষিগণ প্রায় মনুষ্যাদি বৈরিবর্গের দৃষ্টির অগোচর স্থল দেখিয়াই আবাস প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল পক্ষী বৃক্ষশাখায় নীড় নিম্মাণ করে, হিমপ্রধান দেশে সেই সকল পক্ষীকে গিরিগহ্বর-মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়।

ইতর জন্তুগণের আত্মরক্ষা-কৌশল

পশুপক্ষীদিগের আত্মরক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর নখ, দন্ত, শৃঙ্গ প্রভৃতি যাহাকে যে প্রকার উপায় প্রদান করিয়াছেন, বিপৎকালে তাহারা আপনা হইতেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে কিছুমাত্র উপদেশ প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় না। গো, মহিষ, মেষ, ছাগ

জন্তুদিগের পরমেশ্বরদত্ত আত্মরক্ষার উপায়

প্রভৃতি শৃঙ্গধারী পশুগণ যুদ্ধকালে স্বীয় স্বীয় শৃঙ্গ অগ্রবর্ত্তী করিয়া শত্রু আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। শৃঙ্গী পশুরা যেমন বিপৎকালে শৃঙ্গ ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতি দন্ত ও নখযুক্ত পশুগণ কোন বিপদে পতিত বা যুদ্ধে উদ্যত হইলে নখ দন্ত প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় অস্ত্র সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহিষাদি শৃঙ্গধারী পশুরা কদাপি স্বীয় বৈরীর প্রতি দন্তাঘাত বা নখাঘাত করিতে উদ্যত হয় না এবং ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণকেও কদাপি মস্তকাঘাত বা পদাঘাত করিতে দেখা যায় না। শিকার করিবার সময় হস্তী আপন বধ্য বৈরীকে শুণ্ডদ্বারা আক্রমণ করে, দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করে এবং কখন বা পদতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় গুরুতর অঙ্গভারদ্বারা দলনপূর্ব্বক বধ করে। হস্তীর দেহ অতিশয় ভারবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত পশু যেমন স্বীয় শত্রুকে সর্ব্বদা পদতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক নিপীড়ন করিয়া বধ করিবার চেষ্টা পায়, অশ্ব প্রভৃতি অন্যান্য পশুদিগকে কখন সে প্রকার করিতে দেখা যায় না। অশ্বগণ যখন অরণ্যমধ্যে নিদ্রা যায়, তখন তন্মধ্যে একটি অশ্ব জাগ্রৎ থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করে এবং শশ নামক জন্তুগণ যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সে স্বীয় গমন-কৌশল দ্বারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়।

সংস্কার দ্বারা ইতর জন্তুগণ তাহাদিগের শত্রুমিত্র অবগত হইতেও সমর্থ হয়। সর্প, মার্জ্জার ও শৃগালাদি কোন কোন হিংস্র জন্তু পক্ষী-দিগকে হিংসা করিয়া থাকে ; এজন্য পক্ষিজাতি ঐ সকল জন্তু দেখিলেই মুক্তকণ্ঠে স্বজাতীয় ধ্বনি করিতে আরম্ভ করে। কুক্কুটী যখন শ্যেন প্রভৃতি কোন প্রকার হিংস্র পক্ষীর সাক্ষাৎ পায়, তখন সে এক প্রকার সঙ্কেত দ্বারা স্বীয়

ইতর জন্তুর শত্রুর আগমনের সন্ধানপ্রাপ্তি

শাবকগণকে সতর্ক করে, এবং শাবকগণও সেই সঙ্কেত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়। মারমট নামক জন্তুগণ যখন অরণ্যমধ্যে ক্রীড়া করে, তখন তাহাদিগের মধ্যে একটিকে উহারা প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে। ঐ প্রহরী যদি নিকটে বৈরিস্বরূপ কোন মনুষ্য, কুক্কুর কি কোন পক্ষীকে আসিতে দেখে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে একপ্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ করিয়া স্বজাতীয়দিগকে সতর্ক করে এবং তাহারা সেই শব্দ শুনিয়া বিবরমধ্যে প্রবেশ করিলে প্রহরীও তাহাদিগের অনুগামী হয়।

মানবজ্ঞান অপেক্ষা পশু-সংস্কারের ভবিষ্য দৃষ্টি

ইতর জীবজন্তুদিগের সংস্কার কখন কখন মনুষ্যের পরিণাম-দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। সংস্কার দ্বারা কোন কোন জীব অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভাবী ব্যাপারও অগ্রে জানিতে পারে। যখন আমরা কোন মতেই জানিতে পারি না, যখন আকাশে কিছুমাত্র মেঘের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তৎকালেও ভেক, চাতক প্রভৃতি কতিপয় জীব, বৃষ্টির পূর্ব্ব-লক্ষণ জানিতে পারিয়া উল্লাসধ্বনি করিতে থাকে। সংস্কার-প্রভাবে কোন কোন পক্ষী ঋতুবিশেষে দেশবিশেষে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এ দেশে বর্ষাকালে নানাজাতীয় নূতন নূতন পক্ষী দেখা যায়, কিন্তু বর্ষান্তে তাহারা সকলেই এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। অনেক পক্ষী গ্রীষ্মকালে শীতপ্রধান দেশে বাস করে এবং শীতকালে উষ্ণদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কার দ্বারা অনেকানেক পশু শারীরিক রোগের ঔষধ অবগত হইয়া বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় আপনাদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। ভল্লুক এবং নকুল হইতে অনেক প্রকার ক্ষতরোগের ও বিষঘ্ন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিড়াল জাতির কোন রোগবিশেষ উপস্থিত

হইলে তাহাদিগকে এক প্রকার তৃণ ভক্ষণ করিয়া বমন করিতে দেখা যায়।

ইতর জন্তুদিগের বৎসপালন ব্যাপারও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; উহা মনে হইলেও মানস-মন্দিরে জগদীশ্বরের মহিমা দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। চঞ্চলস্বভাব পক্ষিগণ সততই নানাস্থানে অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু ডিম্ব প্রসব করিবার পরেই উহারা আশ্চর্য্য বাৎসল্যভাবে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর নীড়মধ্যে অবস্থিতি করে এবং স্বীয় শরীর দ্বারা সেই প্রসূত ডিম্ব আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে সমুচিত উষ্ণাবস্থায় রক্ষা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীদিগের অণ্ড উক্ত প্রকারে আচ্ছাদন করিয়া না রাখিলে উহার উত্তাপ নষ্ট হইয়া শীঘ্রই ডিম্বের হানি হইতে পারে। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পক্ষিগণের অণ্ডে সমধিক উষ্ণতা বিদ্যমান থাকায় তাহা ঐ প্রকার করিয়া আচ্ছাদন করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া বৃহৎ পক্ষিগণ ডিম্ব প্রসবান্তে মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরেও গমন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহারা বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন প্রসূত ডিম্বগুলিকে নানাবিধ তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া যায়।

ইতর জন্তুগণের বৎসপালন

যে জন্তুর যে প্রকার সংস্কার থাকা আবশ্যক, পরমেশ্বর তাহাকে সেইরূপ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, কাহারও কোন অংশে ন্যূনতা রাখেন নাই। এক প্রকার পক্ষী ডিম্ব প্রসব করিয়া স্থানান্তর গমন করে; কিন্তু ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবার সময় উপস্থিত হইলে সংস্কার দ্বারা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় চঞ্চুদ্বারা সেই সকল ডিম্ব বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করে। অনেকানেক জীব জন্তু গর্ভধারণ

বিভিন্ন জন্তু মধ্যে যথাযোগ্যরূপে সংস্কারনিয়োগ ইহার কার্য্যকারিতা

করিয়া অবধি শাবকের নিমিত্ত ভোজ্য আহরণ করিতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন কীট পতঙ্গাদি স্বজাতীয় জীবিকাস্থান সন্দর্শন করিয়া সেই স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন জন্তু সন্তান রক্ষা করিয়া থাকে। মেষ, কুক্কুট প্রভৃতি যে সমস্ত পশুপক্ষ্যাদি স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি, শাবক রক্ষার জন্য তাহারাও উগ্র স্বভাব ধারণ করিয়া থাকে। ভল্লুকীর সমক্ষে তাহার শাবকগণের প্রতি আক্রমণ করিলে ঘোর প্রমাদ উপস্থিত হয়! আক্রমণকারী ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হয়। ঐরূপ স্বাভাবিক সংস্কার প্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু সকল স্ব স্ব সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সুখে জীবন ধারণ করিতেছে। সংস্কার জীবের প্রধান সহায়। মনুষ্য-শিশুর স্তন্য পান করাও সংস্কারের কার্য্য। বুদ্ধির অভাবস্থলেই জগদীশ্বর সংস্কার প্রদান করিয়াছেন; বুদ্ধি যে স্থলে কার্য্য করিতে অপারগ হয়, সে স্থলে সংস্কার কার্য্য করে। সংস্কারবলে আমরাও অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

Class No. ৪৯১'৫৫
Acc. No. 111 38
Granthagar
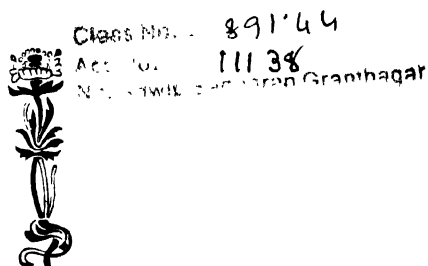
কীট

হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি বৃহৎ পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, সে কৌশল যেমন অনায়াসে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে এবং সে কৌশল সন্দর্শন করিয়া আমরা যেরূপ আশ্চর্য্যসাগরে নিমগ্ন হই, মশক, মক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদির আকৃতিপ্রকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৌশল কখনই সে প্রকার আমাদিগের বোধগম্য হয় না। কিন্তু কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসম্বন্ধীয় অদ্ভুত কৌশলসকল বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যমাত্রকেই বিমোহিত হইতে হয়। যে সমস্ত সূক্ষ্মকায় কীট সহজে আমাদিগের চক্ষুরও গোচর হয় না, যাহাদিগকে হয় ত আমরা কোন জীব বলিয়াই মনে করি না এবং যে সমস্ত কীটাণুদিগের মধ্যে শত শত কীটকে আমরা প্রতিনিয়ত পদতলে নিপীড়ন করিয়া যাতায়াত করি, তাহার একটি কীটমধ্যেও বিশ্বকৌশলকারী বিশ্বেশ্বরের হস্তরচিত কৌশলকলাপের অভাব নাই। তিনি এক একটি কীট পতঙ্গে যে অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্ব-সংসার মধ্যে তাহার তুলনা দিবার আর স্থান দৃষ্ট হয় না। কোন কোন পতঙ্গশরীরের অদ্ভুত কৌশল মনে হইলে সম্মুখস্থ বৃহৎ মাতঙ্গদেহকেও ভুলিতে হয়।

বিশ্বরচয়িতার শক্তি ও মহিমা

জগদীশ্বরের বিচিত্র নির্ম্মাণ-কৌশল

কোন কোন প্রকার মক্ষিকার পুচ্ছাগ্রভাগে বেধনিকা অস্ত্রের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ এক প্রকার ক্ষুদ্র অস্ত্র সংলগ্ন আছে। সূচীসদৃশ ঐ তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র সামান্যতঃ উক্ত মক্ষিকাদিগের অঙ্গমধ্যে সন্নিবিষ্ট

থাকে, কিন্তু প্রয়োজনমতে উহারা সেই অস্ত্র ইচ্ছানুসারে বহির্গত করিয়া আপনাদিগের কার্য্যসাধন করিতে পারে।

—তদ্দৃষ্টান্ত (১) মধুমক্ষিকা।

ঐ মক্ষিকাদিগের পুচ্ছসংলগ্ন উক্ত অস্ত্র সন্দর্শন করিলে আপাততঃ কাহারও মনে বিশেষ আশ্চর্য্য বলিয়া অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু প্রাণিবিদ্যাপরায়ণ পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, উক্ত মক্ষিকাদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে পরম কৌশল করিয়া পরমেশ্বর উহাদিগের পুচ্ছদেশে ঐ প্রকার অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, ঐ অস্ত্র এমন তীক্ষ্ণ ও এমন দৃঢ় যে উহাদ্বারা ঐ মক্ষিকাগণ বৃক্ষপত্র, বৃক্ষশাখা, বৃক্ষস্কন্ধ, শুষ্কদারু ও শুষ্কচর্ম্ম পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিতে পারে এবং কখন কখন প্রয়োজন মতে উহারা ঐ অস্ত্রদ্বারা প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থ পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ অস্ত্রদ্বারা উহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোন পদার্থ বিদ্ধ করিয়া সেই ছিদ্রমধ্যে আপনাদিগের ডিম্ব প্রসব করে। উক্ত অস্ত্রমধ্যে আরও এই এক বিশেষ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসি যেমন কোষমধ্যে নিহিত থাকে, মক্ষিকার পুচ্ছসংলগ্ন উক্ত অস্ত্রকেও জগদীশ্বর সেইরূপ একপ্রকার কোষাভ্যন্তরে রক্ষা করিয়াছেন। যে চর্ম্মময়কোষ মধ্যে ঐ অস্ত্র নিহিত থাকে, সেই কোষমধ্য দিয়া মক্ষিকাগণ আপনাদিগের গর্ভস্থ ডিম্ব নির্গত করিয়া উক্ত অস্ত্রকৃত সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে রক্ষা করিতে পারে। উক্ত মক্ষিকাদিগের শরীরে এ প্রকার অস্ত্র না থাকিলে উহাদিগের সন্তান রক্ষা করা কঠিন হইত।

(২) হস্তী

হস্তীর শিরোদেশে যেমন বিলম্বিত শুণ্ড সংলগ্ন আছে, কোন কোন কীটশরীরেও সেই প্রকার শুণ্ডাকার লম্বমান একটি অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শুণ্ডমধ্যে

জগদীশ্বর যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহাদ্বারা অসংখ্য কীট যে দুষ্কর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। যে সকল কীটশরীরে উক্ত প্রকার শুণ্ড সংলগ্ন আছে, তাহারা উহাদ্বারা এমন সকল মহৎ মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধ করে এবং তাহাদিগের পক্ষে উক্ত শুণ্ড এত আবশ্যক যে, উহা না থাকিলে তাহারা কোন রূপেই জীবন ধারণ করিতে পারিত না; কিন্তু ঐ সমস্ত ক্ষুদ্রকীটের শরীরস্থ অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড এত দুর্ব্বল যে, তাহা সততই নানা কারণে আহত বা ভগ্ন হইয়া যাইতে পারে, এই নিমিত্ত পরম দয়াবান্ পরমেশ্বর, কীটবিশেষে ঐ শুণ্ড রক্ষার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন।

মধুমক্ষিকাগণ পুষ্পগর্ভে যে শুণ্ড সন্নিবেশ করিয়া মধুপান করে, উহাদিগের সেই শুণ্ড দুই অংশে বিভক্ত। শুণ্ডের মধ্যভাগে

মধুমক্ষিকা ও হস্তীর অঙ্গসামঞ্জস্য ও তুলনা

একটি সুন্দর গ্রন্থি আছে, মস্তক অবধি ঐ গ্রন্থিপর্য্যন্ত একভাগ এবং গ্রন্থি অবধি শুণ্ডের শেষপর্য্যন্ত আর একভাগ। উহাদিগের ইচ্ছা হইলে উহারা শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া তাহার অগ্রভাগ উপরিভাগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে এবং সহজে কোন কারণদ্বারা শুণ্ডেতে আর আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রজাপতিদিগের শুণ্ডও অতি আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পায়, উহারাও প্রয়োজন মতে স্বীয় স্বীয় শুণ্ডকে সংকোচ ও বিকোচ করিতে পারে। উহাদিগের ঐ শুণ্ড সর্ব্বদা ঘড়ির তারের ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি হইয়া থাকে; কিন্তু প্রয়োজনমতে সরল করিয়া তদ্দ্বারা উহারা মধুপানাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে পারে। অন্যান্য জীবজন্তুর মুখদ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন

হয়, মধুকর শুণ্ডদ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, উহারা যে শুণ্ডদ্বারা পুষ্পগর্ভ হইতে মধু আকর্ষণ করে, সেই শুণ্ডদ্বারাই মধুপান করিতে পারে।

মধুকরদিগের মধুপান ক্রিয়ার তুল্য অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদিগের এক শুণ্ডে জগদীশ্বর যদি ঐরূপ দ্বিবিধ প্রকার শক্তি প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আর উহাদিগের ক্লেশের পরিশেষ থাকিত না। মধুকরজাতি যে পুষ্পমধু পান করিয়া জীবনধারণ করে, তাহা গভীর পুষ্পগর্ভ মধ্যে অতি সংকীর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকে; মধুকর সেই স্থানে স্বীয় সূক্ষ্ম শুণ্ড সন্নিবেশ করিয়া অল্পে অল্পে মধু শোষণপূর্ব্বক উদরস্থ করিতে পারে। পুষ্পের মধ্যে যে স্থানে মধু থাকে, মধুকরদিগের শুণ্ড ভিন্ন অন্য কোন পদার্থদ্বারা সেই স্থান হইতে মধু আহরণ করা সাধ্য হয় না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অসীম জ্ঞানাকর জগদীশ্বর যথাযোগ্যরূপে সমস্ত কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীব জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া সকলকেই সুখী করিয়াছেন, তাঁহার কৌশল প্রভাবে হস্তী আপনার স্থূল গ্রীবা, বিলম্বিত শুণ্ড ও সবল শরীর লইয়া যেমন স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক আপনার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছে, অতি ক্ষুদ্র কীটাণু সকলও স্ব স্ব আকৃতি লইয়া সেইরূপ সুখে জীবিত রহিয়াছে।

৩) মধুকর, জগদীশ্বরের কৌশলপ্রভাব

কোন কোন কীটের অবস্থানান্তর প্রাপ্ত হওয়াও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লোমযুক্ত যৎসামান্য কীটকে যিনি মনোহর চিত্র বিচিত্রময় প্রজাপতিরূপে পরিণত হইতে দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, যে কীটের অবস্থান্তরিত হওয়া কি

কীটের অবস্থানান্তর প্রাপ্তি প্রজাপতি

অদ্ভুত ব্যাপার! যে কীট পরিণামে সুদৃশ্য প্রজাপতিরূপ ধারণ করে, প্রথমে তাহার যেপ্রকার অবয়ব থাকে তদ্দর্শনে কাহারও এমন বোধ হয় না যে, ইহা কোন কালেই সুদৃশ্য প্রজাপতিরূপে পরিণত হইতে পারিবে। উক্ত কীটের শরীর হইতে কেবল পক্ষমাত্র উত্থিত হওয়াতেই যে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় এমন নহে, প্রথমে উহার দন্ত ও হনুযুক্ত মুখ থাকে, পরে তাহার পরিবর্ত্তে এক শুণ্ড উৎপন্ন হয় এবং প্রথমে উক্ত কীটের যে স্থলে ১৪টি স্থূল পদ দর্শন করা যায়, পরিণামে সেইস্থলে ছয়টি সূক্ষ্ম জঙ্ঘা মাত্র বাহির হয়। কি প্রণালীক্রমে যে উক্তপ্রকার সামান্য কীট হইতে অপূর্ব্ব প্রজাপতির উৎপত্তি হয় তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, প্রথমে তাহাদিগের দেহমধ্যে ঐ সমস্ত পক্ষাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমুদয় চিহ্ন গুঢ়রূপে অবস্থিত থাকে, পরিণামে সেই সমস্ত অঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ পাইলে পর উক্ত কীটদিগের এক অপূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

উর্ণনাভ ও তন্তুকীট আকৃতি ও প্রকৃতি

ঊর্ণনাভ ও তন্তুকীটের আকৃতি প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। যে যন্ত্রদ্বারা তার প্রস্তুত হয়, উহাদিগের উদর তাহার অবিকল অনুরূপ। তন্তুকীটের উদর মধ্যে অদ্ভুতকৌশলবিশিষ্ট দুইটি চর্ম্মময় কোষ আছে, ঐ কোষদ্বয় উক্ত কীটের উদরস্থ অন্ত্র বেষ্টন করিয়া অবস্থিত থাকে, কেহ কেহ ঐ চর্ম্মময় কোষ পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ ইঞ্চির ন্যূন নহে। ঐ কোষ মধ্যে এক প্রকার লালবৎ আর্দ্র পদার্থ সঞ্চিত থাকে, সেই লাল দ্বারাই অপূর্ব্ব রেশম উৎপন্ন হয়। যে কোষদ্বয়ের মধ্যে উক্ত
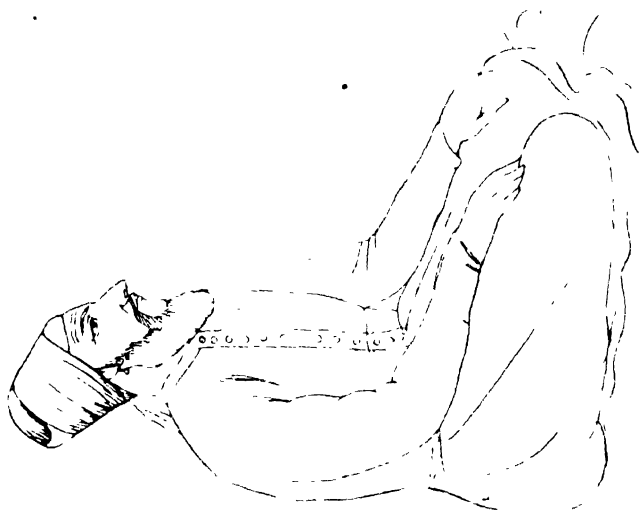
লালা থাকে সেই কোষের বহুছিদ্রময় ছুইটি দ্বার আছে, ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্রময় দ্বার হইতে সেই লালা নির্গত হওয়াতেই প্রথমতঃ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশের মত সূত্র উৎপন্ন হয়, পরে সেই সকল সূক্ষ্ম সূত্র একত্র হইয়া উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত হয়। তন্তুকীট মুখ হইতে সেই লালাময় তন্তু বাহির করিয়া প্রথমে তাহার একাগ্রভাগ কোন একটি পদার্থে সংলগ্ন করিয়া ক্রমাগত স্বীয় শরীর বর্ণিত করে। ক্রমে তদ্দ্বারা গুটিকার উৎপত্তি হয়।

রেশমসূত্রের উৎপত্তি

স্বর্ণ, রৌপ্যাদি ধাতু হইতে তার প্রস্তুত করা অপেক্ষা লালাবৎ একপ্রকার আর্দ্র পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন করা যে কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইহার তুল্য অদ্ভুত শিল্পকার্য্য আর কি আছে? কোন ধাতু হইতে তার প্রস্তুত করিতে হইলে, কেবল সে ধাতুর আকারের বৈলক্ষণ্য হয়, তাহার স্বরূপের কিছুমাত্র অন্যথা হয় না; কিন্তু তন্তুকীটের উদরস্থ লালা যখন রেশমে পরিণত হয়, তখন উক্ত লালার স্বরূপেরও অন্যথা হইয়া যায়। তখন তাহার আর্দ্রতা প্রভৃতি গুণের পরিবর্ত্তে দৃঢ়তা এবং স্থিতিস্থাপকতাদি গুণের উৎপত্তি হয়।

মধুক্রম নির্ম্মাণ ও মধুসঞ্চয়কৌশল

মধুমক্ষিকাগণ যে প্রকার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে এবং যে প্রকার অদ্ভুত কৌশল দ্বারা তন্মধ্যে মধু রক্ষা করে, তাহা মনে হইলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, ভবিষ্যতে উপভোগ করিবার উদ্দেশে মধুমক্ষিকারা বুদ্ধিমান্ ও মিতব্যয়ী মনুষ্যের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, কিন্তু জগদীশ্বর যদি উহাদিগকে মধুক্রম নির্ম্মাণ করিবার অদ্ভুত শক্তি অর্পণ

না করিতেন, তাহা হইলে উহাদিগের পূর্ব্বোক্ত পরিণামদৃষ্টি কোন কার্য্যেরই হইত না। মধুমক্ষিকারা যেমন মধুক্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রমধ্যে পুষ্পমধু বিভক্ত করিয়া রাখে, সেইরূপ অল্প অল্প অংশে বিভক্ত না করিয়া একত্র অধিক মধু রক্ষা করিলে তাহা অতিশীঘ্রই বিকৃত হইয়া যাইত। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগদীশ্বর উহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে উহাদিগকে এক একটি অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। মধুমক্ষিকারা যে পুষ্পে মধু পান করিতে গমন করে, সেই পুষ্প হইতেই তাহার রেণু লইয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে। নলিনবৎ পুষ্পরেণু হইতে রসাদ্র মধাচ্ছন্ন উৎপন্ন হওয়া যে কতদূর আশ্চর্য্য ব্যাপার, পাঠকগণ একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, খদ্যোতের পুচ্ছদেশে ফস্‌ফোরাস নামক একপ্রকার পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে উহাদিগের শরীর হইতে দীপালোকবৎ আলোক নির্গত হয়। খদ্যোতের পুচ্ছদেশে এইরূপ আলোকের সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর এককালে কৌশল ও করুণার শেষ করিয়াছেন।

খদ্যোতপুচ্ছে আলোকের আবশ্যকতা

সরস্বতীতীরে

গ্রীষ্মাবসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। শ্যামল জলদজাল নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন

বর্ষাকাল

মুষলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। বিভাকরের প্রভামণ্ডল একবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামিনীর প্রভাশ্রেণী সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপ স্বরূপ হইয়াছে।

নবীন তৃণসমাচ্ছন্ন অবনী বর্ষানীরে অভিষিক্ত হইয়া শান্ত ও মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল—দংশ ও বিষধরকুলের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বারি বিস্তীর্ণ হইলে সম বিষম ভূতল, নদী-নিবহ ও অন্যান্য স্থাবর সকল আর অনুভূত হইল না। তীব্রবেগবতী ক্ষুদ্র-সলিলা স্রোতস্বতী সকল কল কল রবে বাণধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলী সকল পরিশোভিত করিল। তাহার মধ্যে ধারাজলসমাচ্ছন্ন বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণের বহুবিধ আনন্দ-নিনাদ কেবল কর্ণগোচর হইতে লাগিল। চাতক, ময়ূর ও পুংস্কোকিলকুল একান্ত মত্ত এবং দর্দ্দুরসকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল। অরণ্য ও পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৃণসমূহ সমুৎপন্ন, নিম্নগাসকল স্বচ্ছসলিল, আকাশমণ্ডল

শরৎকাল

নির্ম্মল ও নক্ষত্রনিবহ সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিল। রজোবিহীন জলধর শীতল বিভাবরী গ্রহ,

নক্ষত্র ও শশাঙ্কমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নদী ও পুষ্করিণী সকল কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লারে সমলঙ্কৃত, অতি শীতল ও প্রশান্তদর্শন হইল। বেতসলতাসঙ্কুল নীলতটশালী সরস্বতীতে ভ্রমণ করিয়া মানবগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রীট দ্বীপ

ক্রীট দ্বীপ

গগনলক্ষ্মী জলদমণ্ডলের ও সাগরগর্ভোত্থ উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া ক্রীট দ্বীপের পর্ব্বতশ্রেণী অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন যূথমধ্যে বৃদ্ধ মৃগেরই বিশাল বিষাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্রত্য গিরিসমূহমধ্যে আইডা পর্ব্বতের উন্নত শিখর অনতিবিলম্বেই লক্ষিত হইল। ক্রীট দ্বীপ পরম রমণীয় স্থান, দর্শন-মাত্র রঙ্গভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ক্রমে ক্রমে উহার উপকূলদেশ সুস্পষ্ট অবলোকিত হইতে লাগিল। সাইপ্রস দ্বীপের ভূমি যেমন

অকৃষ্ট ও শস্যাদিশূন্য, ক্রীট দ্বীপের ভূমি সেরূপ নহে ; উহা প্রজাগণের শ্রমবলে অত্যন্ত উর্ব্বরা, বিবিধ শস্যে ও অশেষবিধ পুষ্পফলে অলঙ্কৃতা।

অল্পকাল পরেই অসংখ্য পরম রমণীয় গ্রাম ও মহাসমৃদ্ধ নগর-সকল আমাদিগের নয়নগোচর হইল। সেখানে এমন ক্ষেত্রই দৃষ্ট হইল না যে, উহা কৃষীবলগণের শ্রমসূচক চিহ্নে অঙ্কিত নহে ; একটি কণ্টকবৃক্ষ বা তৃণ লক্ষিত হইল না। ঐ দ্বীপের মনোহর শোভা সন্দর্শনে অন্তঃকরণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয় ! উপত্যকাপ্রদেশে বহুসংখ্যক পশুযূথ চরিয়া বেড়াইতেছে ; ক্ষুদ্র তরণীসকল নিরন্তর প্রবলবেগে প্রবহমাণ হইতেছে, মেষগণ পর্ব্বতের উৎসঙ্গদেশে স্বচ্ছন্দে শস্য ভক্ষণ করিতেছে, ক্ষেত্র সকল অশেষবিধ শস্যে সুশোভিত ও পরিপূরিত রহিয়াছে ; ফলভরনামিত দ্রাক্ষালতা স্নিগ্ধ হরিৎ পল্লব দ্বারা পর্ব্বতসমূহের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

—তথাকার মনোহর শোভা

এই দ্বীপ শতসংখ্যক মহানগরে অলঙ্কৃত ; ইহা এমন সুন্দর যে, বিদেশীয় লোক দেখিবামাত্র ভূয়সী প্রশংসা করে। অত্রত্য অসংখ্য নিবাসীদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী এই দ্বীপেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যাহারা যেরূপ পরিশ্রম-সহকারে ভূমি কর্ষণ করে, বসুন্ধরা দেবী প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করেন। যে দেশে অধিক লোক, সে সকল লোক অলস না হইলে, তথায় ততই সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় এবং পরস্পর অসূয়া বা বিদ্বেষ প্রদর্শনের অবকাশ বা আবশ্যকতা থাকে না। ভূতধাত্রী বসুন্ধরা, স্বীয় সন্তানদিগকে অক্লেশে পরিশ্রম করিতে

সুদৃশ্য নগরাবলী—অধিবাসিগণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যোৎপত্তি

দেখিলে প্রসন্না হইয়া তাহাদিগের সংখ্যানুসারে শস্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। দুরাকাঙ্ক্ষা ও অপরিমিত ধনতৃষ্ণাই মানবজাতির দুঃখসমূহের একমাত্র কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যান্য লোকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ করে এবং এইরূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকার-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থক মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়। যদি মানবগণ স্ব স্ব আবশ্যক বিষয়মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সমৃদ্ধি, প্রণয় ও শান্তি সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইয়া উঠে।

বালকগণের শিক্ষা—অধিবাসিগণের গুণাবলী ও বাগাবড়া—তাহাদের পাপবোধ

তত্রত্য বালকদিগের বিদ্যোপার্জ্জনের নিমিত্ত যে নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, তদ্দ্বারা শরীর নীরোগ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন, এবং বাল্যকাল হইতেই মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রমের অভ্যাস জন্মিতে থাকে। ইন্দ্রিয়দমনাদি দ্বারা অনর্থকরী বিষয়লালসার অপ্রবৃত্তি হইলে, ও প্রশংসনীয় অশেষ গুণরত্নে অলঙ্কৃত বলিয়া মানবমণ্ডলীতে খ্যাতিলাভ করিলে, যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন সুখই তাহারা অভিলষণীয় জ্ঞান করে না। রণস্থলে মৃত্যুভয়ে অভিভূত না হওয়াই যে সাহসের প্রকৃত কার্য্য এমন নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যে অশ্রদ্ধা ও লজ্জাকর সুখসম্ভোগে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও সাহসের প্রকৃত কার্য্য। কৃতঘ্নতা ও অর্থগৃধ্নুতা অন্যান্য স্থানে অসৎকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু ক্রীট দ্বীপে তৎসমুদয় উৎকট পাপরূপে পরিগণিত ও সেই সেই উৎকট পাপের যথোচিত দণ্ড হইয়া থাকে।

সকলে মনে করিতে পারেন যে, ক্রীট দ্বীপে ঐকান্তিকী বিষয়-সুখাসক্তির ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের প্রতিষেধক কোন নিয়ম অবশ্যই

আছে ; ক্রীটবাসীরা ঐ দুই দোষের অস্তিত্বই অবগত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমুচিত পরিশ্রম করে, কিন্তু কেহই ধনী হইবার চিন্তাও করে না। স্বচ্ছন্দে ও সুপ্রণালীতে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ ও জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রীর নির্ব্বিঘ্নে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ হইলেই তাহারা স্ব স্ব পরিশ্রম সার্থক বোধ করে। সুরম্য হর্ম্ম্য, মহামূল্য গৃহোপকরণ, সৌষ্ঠবসম্পন্ন বহুমূল্য পরিচ্ছদ, ও বৈষয়িক-সুখ-সংঘটিত উৎসব ক্রীড়া তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ। তাহাদের পরিচ্ছদ অত্যুৎকৃষ্ট ঊর্ণাতে প্রস্তুত ও অতি মনোহর বর্ণে রঞ্জিত বটে, কিন্তু উহা সুবর্ণসূত্রে বিচিত্রিত বা অন্য কোনও প্রকারে অলঙ্কৃত নহে।

ক্রীটবাসিগণের প্রকৃতি—পরিশ্রম-পরায়ণ ও বিলাসস্পৃহা-শূন্য

তাহাদের আহার সামগ্রী সামান্য ফল, মূল, দুগ্ধ ও গোধূম-পিষ্টকের অতিরিক্ত নহে। পরিশ্রমক্ষম দৃঢ়কায় পশুসকল শ্রমসাধ্যকার্য্যে নিয়োজিত থাকে। তাহাদের গৃহগুলি প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ও সর্ব্বাংশে বাসোপযোগী, কিন্তু চিত্রিত বা অন্য কোনও প্রকারে অলঙ্কৃত নহে। তাহারা গৃহনির্ম্মাণবিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ; কিন্তু কেবল দেবায়তন নির্ম্মাণেই নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাহাদের মতে মনুষ্যের অট্টালিকায় বাস করা ধৃষ্টতা ও অহঙ্কার প্রদর্শন মাত্র। স্বাস্থ্য, বীর্য্য, পরাক্রম নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিরোধে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা, আবশ্যক বিষয়ের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অধিকার, অনাবশ্যক ও অনুপযোগী বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন, পরিশ্রমশীলতা, আলস্যে দ্বেষ, ধর্ম্মানুষ্ঠানে জিগীষা, সর্ব্বপ্রযত্নে বিধি প্রতিপালন ও দেবভক্তি, এই সমুদয় ক্রীটবাসীদিগের ঐশ্বর্য্য—অন্যবিধ ঐশ্বর্য্যে তাহাদের যত্ন ও আদর নাই।

—তাহাদের আহার সামান্য, বাসস্থান আড়ম্বরহীন ও পরিচ্ছন্ন

ফর্দ্দ সী

ফর্দ্দুসী নামক সুবিখ্যাত কবি-বিরচিত 'শাহ্-নামা' বা 'রাজাবলী' পারস্য ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রাচীন বীররসাশ্রিত কাব্য।

শাহ্‌নামা

এই গ্রন্থের অলৌকিক রস-মাধুর্য্য বিষয়ে স্যর্ উইলিয়ম জোন্স লিখিয়াছেন যে, ইলিয়াডের রচনা যাদৃশ সুকোমল ও সুমিষ্ট, ফর্দ্দসীর কাব্যও কোমলতা ও মাধুর্য্য বিষয়ে তদ্রূপ প্রশংসনীয়। ফর্দ্দুসী হোমরের তুল্য কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন কি না, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থখানি যে মানবকবিত্বশক্তির এক শ্রেষ্ঠ ফল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পারস্য দেশীয় ভুবনবিখ্যাত সম্রাটদিগের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনই এই গ্রন্থের স্থূল তাৎপর্য্য।

'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থের অনুবাদ

ইহার আদি বৃত্তান্ত এই যে, খালিফা হারুণ অল রশীদের পুত্র সুবিখ্যাত মামুন, একদা কতিপয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে গুণগ্রাহী নৃপতিদিগের কীর্ত্তিকথাপ্রসঙ্গে শ্রুত হইয়াছিলেন যে, পারস্য দেশীয় প্রাচীন প্রাজ্ঞ অধিপতি নোসেরওয়াঁ সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে বহুকষ্টে সংগ্রহ করাইয়া তদ্দেশের প্রাচীন পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া ভূমণ্ডলে চিরস্মরণীয় অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। মামুন, যশোলিপ্সাপরতন্ত্র হইয়া পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ আনয়নপূর্ব্বক তাহা আরব্য ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া খোরাসানের অধিপতি আমীর সৈয়দ আহম্মদ কিয়ৎকাল পরে আরব্য অনুবাদ আদর্শ করিয়া

পারশ্য ভাষায় তাহার অনুবাদ করনে। পঞ্চতন্ত্রের এবম্প্রকার অনুবাদকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমদেশস্থ যবনগণ বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময়ে অন্যান্য ভূপালগণ, পারশ্য দেশের পুরাবৃত্ত-সঙ্কলনে উৎসাহী হইয়া কোন কোন রাজ্যের ইতিহাস সঙ্কলন করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ না হওয়ায়, গজনীর অধিপতি সুলতান মহমুদ তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পুরাবৃত্ত সঙ্কলনের চেষ্টা

সুলতান মহমুদ তৎকালে ভারতবর্ষের অতুল সম্পদ লইয়া গজনী রাজধানী শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক বিদেশীয় পণ্ডিত দ্বারা তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল হইয়াছিল। মহমুদ ঐ সমস্ত পণ্ডিতগণসমক্ষে একদিবস আক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন, পারশ্যজাতি কাব্য-রচনায় অতিশয় দক্ষ। কিন্তু 'সয়রউল্-মুলক' ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কাব্যাকারে প্রচারিত হয় নাই: এখন তাহা কাব্যাকারে প্রচারিত করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এই সময় প্রসিদ্ধ অনসরী কবি তাহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন,—'একবার ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ কোন কবি কাব্যাকারে রচনা করেন; কিন্তু তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তিহেতু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। এখন আপনি ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করাইলে লোকসমাজে বিশেষ যশস্বী হইতে পারিবেন।' মহমুদ এই বাক্য শুনিয়া অতি উৎসাহ সহকারে অনসরীর প্রতি এই কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। কিন্তু, প্রাচীন আদর্শগ্রন্থের অভাব ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত তাঁহা আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

সুলতান মহমুদের কাব্যপ্রচার চেষ্টা

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে কুরফর্জনামা এক সাগ্নিক পারশী, রাজবংশীয় গৃহবিবাদসূত্রে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গজনীতে

উপস্থিত হইল। কিন্তু সুলতানকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করা দূরে থাকুক, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, একদিন তাহার অত্যন্ত বিষণ্ণবদন এবং বাষ্পপূর্ণ নেত্র দেখিয়া এক পুরোহিত অত্যন্ত করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন। ঐ ব্যক্তি স্বদেশের একখানি প্রাচীন ইতিহাস যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। মহমুদ এই গ্রন্থ, ভবিষ্য 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থের আদর্শ করিয়া, তন্মধ্য হইতে সাতটি বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া আদর্শস্বরূপ সাতজন কবিকে কাব্যাকারে রচনা করিবার আদেশ প্রদান করেন। অনসরীর কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায়, সমগ্র গ্রন্থ প্রণয়নের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল।

আদর্শগ্রন্থ সংগ্রহ ও রনার ভারার্পণ

দৈববশে আর এক জন পরীক্ষার্থী এই সময় গজনী রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন—ইঁহারই নাম আবুল কাশিম মনসুর ফর্দ্দুসী। তাঁহার পিতার নাম ইসাক ইব্রশাহ অথবা ফকিরুদ্দিন মহমূদ। তিনি তুস নগরে এক ধনাঢ্যের উদ্যানপাল ছিলেন। ফর্দ্দুসীর জন্মগ্রহণসময়ে (৯৩৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার পিতা নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সুকুমার তনয় কোন অট্টালিকার ছাদে আরোহণপূর্ব্বক মক্কার অভিমুখে প্লুত স্বরে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিলে, চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জনপদ তাহার উত্তর প্রদান করিল। প্রভাত হইলে, তিনি কোন স্বপ্নবেত্তাকে তন্মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, এই স্বপ্ন শুভবাঞ্জক। তাঁহার পুত্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন এবং তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাক্যে ইসাক অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া পুত্রকে যত্নে শিক্ষা প্রদান ও লালন

ফর্দ্দুসী -পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

পালন করিয়াছিলেন। 'মজালিস-উল্-মোমনীন্' নামক গ্রন্থ-রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, ফর্দ্দুসী যৎকালে তূস নগরে স্বীয় ভবনে অবস্থিতি করিতেন, তখন তিনি উদ্যানপ্রান্তবর্ত্তী একটা নদীর কূলে উপবেশন করতঃ কাব্য রচনা করিতেন; কিন্তু ঐ সময়মধ্যে স্রোতঃ আগমন পূর্ব্বক নদীতট উপপ্লাবিত করাতে, তিনি হতোদ্যম হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেন। তন্নিমিত্ত তিনি মনোমধ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে—'যদি কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, তবে এই নদীতট বান্ধাইয়া নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিব।' ফর্দ্দুসী এই প্রতিজ্ঞা কদাপি বিস্মৃত হন নাই।

ফর্দ্দুসীর কবিখ্যাতি প্রচারিত হইলে, গজনীতে আগমনজন্য মহমূদের নিকট হইতে এক অনুরোধপত্র প্রাপ্ত হন। ফর্দ্দুসী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেও, পূর্ব্বকথিত নদীর পাড় বান্ধাইবার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য বিদেশ যাত্রা করিলেন।

অনসরী মহমূদের সভামধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ফর্দ্দুসীর আহ্বানসংবাদ শ্রবণে ঈর্ষান্বিত অনসরীর ক্ষুদ্রাশয়তা হইয়া চাতুরীপূর্ব্বক তূস নগরে এক দূত প্রেরণ করেন। প্রতারক দূত, নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া ফর্দ্দুসীকে গজনী নগর আগমনে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, অনসরী মহোল্লাসে দুইজন প্রিয়মিত্রের সহিত রাত্রিকালে উদ্যানমধ্যে এক ভোজের আয়োজন করেন। ফর্দ্দুসীও সেই রাত্রে গজনীতে উপনীত হইয়া সেই উদ্যানমধ্যে আশ্রয়প্রার্থী হন। অনসরী তাহাকে সামান্য লোক ভাবিয়া কহিলেন—'ভ্রাতঃ আমরা তিনজনেই সুকবি—বহুজনতাচ্ছন্ন নগর পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন উদ্যানে রজনী সম্ভোগার্থ আগমন করিয়াছি। আমাদের পণ যে, কবি ভিন্ন কাহাকেও

এস্থানে আসিতে দিব না'। এই কথা শুনিয়া ফর্দ্দুসী কহিলেন—'দাসও আপনাদের চরণপ্রসাদে একজন কবি'। অনসরী তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন—'ভাল, আমরা তিনজনে যে শ্লোকের তিন পাদ রচনা করিব, তুমি যদি তাহার চতুর্থ পাদ পূরণ করিতে পার, তবে আমাদের সহিত আহার ও আমোদ প্রমোদ করিতে পাইবে—নচেৎ এখনই স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে হইবে'। ফর্দ্দুসী ঐ পণে স্বীকৃত হইলে, কবিবর এমত মিত্রাক্ষরে তিনচরণ কবিতা রচনা করিলেন, যাহার অনুপ্রাস পারশ্যভাষায় তিনটির অধিক ছিল না। সুতরাং তাহারা ভাবিয়াছিল,

ফর্দ্দুসীর জয়
আনসরীর হিংসা

অনুপ্রাসাভাবে চতুর্থপাদ রচনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু পারশ্যদেশের এক যোদ্ধার নামে ঐ অনুপ্রাস সংযুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ চতুর্থ পাদ পূরণ করিয়া দিলেন। তদনন্তর দীর্ঘকাল শাস্ত্রালাপ করিয়া অনসরী দেখিলেন যে, ফর্দ্দুসী একজন প্রধান কবি। এই নিমিত্ত হিংসাপরবশ হইয়া যাহাতে তাদৃশ অসাধারণ কবি, মহমূদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকেন, তদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই চারি দিন গত হইলে ফর্দ্দুসী, মহমূদের একজন অমাত্যের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়া, প্রত্যহ সায়ংকালে একাকী তাঁহার বাটী

ফর্দ্দুসীর রাজসভায়
প্রবেশ ও রাজানুগ্রহ
লাভ

গিয়া স্বরচিত নিত্য নূতন চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই অমাত্য একদিন রাজসভায় এই কবিতা পাঠ করিলে মহমূদ ও সভাস্থ সকলেই কবিত্ব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহমূদ কবির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অমাত্য কহিলেন—'আপনার এক দরিদ্র প্রজা তুসের শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক

অন্যায়রূপে উৎপীড়িত হইয়া বিচার প্রার্থনায় এখানে আগমন করিয়াছেন, এ সকল কবিতা তাঁহারই রচিত'। মহমূদ তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। ফর্দ্দুসী রাজসভায় প্রবেশ করিয়া যে কয়টি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন, তাহাতে মহমূদ পরিতুষ্ট হইয়া সমাদরপূর্ব্বক, তাহার সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনসরী সেই রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কবিতা শ্রবণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সহসা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন—'ফর্দ্দুসী দীর্ঘজীবী হউন: ইনি কবিবৃন্দের চূড়ামণি—আমরা সকলেই ইহাঁর শিষ্য! এই প্রশংসা বাক্য শুনিয়া অনসরীর পরিবর্ত্তে মহমূদ ফর্দ্দুসীকেই প্রস্তাবিত গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত করিলেন এবং কবিতার শ্লোক প্রতি এক এক স্বর্ণমুদ্রা মূল্যস্বরূপ প্রতিদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনসরীর মত পরিবর্ত্তন, ফর্দ্দুসীর শিষ্যত্ব স্বীকার

ফর্দ্দুসীকে কাব্যরচনায় নিয়োগ ও পুরস্কার নির্দ্দেশ

অনেক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে না পারিলে, কেহই ভূপতির প্রিয়পাত্র হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। ফর্দ্দুসী একে একে তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া মহমুদের রাজসভায় ত্রিংশৎ বর্ষকাল বাস করেন। এই সুদীর্ঘ কাল পরিশ্রমের পর গ্রন্থ রচনা সমাধা হইলে, মহমূদ তাঁহার অমাত্যের প্রতি ফর্দ্দুসীকে প্রতিশ্রুত সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু চতুর অমাত্য, ফার্দ্দুসীকে তাঁহার ন্যায্যপ্রাপ্য ষষ্টিসহস্র সুবর্ণ-মুদ্রার পরিবর্ত্তে রজতমুদ্রা প্রেরণ করেন। ইহাতে ফর্দ্দুসী কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ

'শাহ্‌নামার' রচনা সমাপ্তি—ফার্দ্দুসীর লাঞ্ছনা

ষষ্ঠিসহস্র ঐ সমস্ত অর্থ, ঐ অর্থ-বাহক ও অপর দুই ব্যক্তিকে বিতরণ করিয়া দিলেন। অমাত্য কুপিত হইয়া এই কথা মহমূদের সমীপে অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার নামে রাজ-অপমানের দোষারোপ করেন, তিনি প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া ফর্দ্দ্‌সীকে সংহার করিবার আদেশ প্রদান করেন। অনেক অনুনয়বিনয়ের পর ফর্দ্দ্‌সী মহমূদের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গজনী পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন।

প্রস্থানকালে মহমূদের প্রতি ফর্দ্দ্‌সীর উপদেশবাণী

দুঃখিত ও শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতে করিতে ফর্দ্দ্‌সী সুলতান মহমূদের সভা হইতে পলায়ন করিয়া এক রাজভৃত্যের আলয়ে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ ভৃত্য ফর্দ্দ্‌সীর প্রতি অনুরক্ত ছিল—সেই জন্য তিনি উহার নিকট আপন লাঞ্ছনার কথা বিবৃত করিলেন। তদনন্তর কতকগুলি ধিক্কারপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া ঐ ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন—'আমি এই নগর হইতে প্রস্থান করিলে এই কবিতাগুলি সুলতানের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিবে যে, হতভাগ্য ফর্দ্দ্‌সী গমনকালে এই নীতিমূলক কবিতা-হার আপনাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, এবং বলিয়া গিয়াছেন, --যখন রাজানুগ্রহ-গর্ব্বিত লঘুপ্রকৃতি লোক নিজের ন্যায় আপনাকে ক্ষুদ্রাশয় করিতে সচেষ্ট হইবে, এই কবিতাগুলি তৎকালে পাঠ করিলে তাহারা অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।" ফর্দ্দ্‌সী গজনী হইতে পলায়ন করিলে আপামরসাধারণ সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং নিরপেক্ষ লোকেরা সুলতানকে অহঙ্কারী, গর্ব্বিত, মাৎসর্য্যশালী বলিয়া অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ফর্দ্দ্‌সী গজনী পরিত্যাগ করিয়া কোহিস্থানে গমন করেন এবং

তত্রস্থ নৃপতির আনুকূল্যে কিয়দ্দিবস শ্রান্তি দূর করতঃ মাজন্দরাণ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জনপদস্থ রাজন্য-বর্গ মহমূদের প্রতাপে এতাদৃশ শঙ্কিত ছিলেন যে, কেহই তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে সমাদর করিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর তিনি বোগ্‌দাদ নগরে উপস্থিত হইয়া প্রচ্ছন্নাবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করিলে পর, তথায় পূর্ব্বপরিচিত এক বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বণিক্, বন্ধু ফর্দ্দুসীর লাঞ্ছনার বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। একদিন সে আপন আলয়ে বোগদাদাধিপতি খালিফের অমাত্যকে আহ্বান করিয়া সুলতানের অসৎকীর্ত্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিল। অমাত্য ঐ সময় ফর্দ্দুসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—সুলতান লোষ্ট্রাঘাতে এই মহাকীর্ত্তি পর্ব্বতের চূড়া অবনত করিবার মানস করিয়াছেন! স্থূলদৃষ্টি রাজাদিগের ইহা ভিন্ন পৌরুষ ও বীরত্ব কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে?" বণিক্ তাঁহার এই পরিহাসে পরম হর্ষিত হইয়া কবি-কেশরী ফর্দ্দুসীকে খালিফার সভায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন। সচিব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া খালিফার সহিত ফর্দ্দুসীর পরিচয় করিয়া দিলেন।

খালিফের সহিত ফর্দ্দুসীর পরিচয়

খালিফা, ফার্দ্দুসীকে মহাযত্নে আপন ভবনে রাখিয়া নিত্য তাঁহার কবিতা-কুসুমের পীযূষ পানে পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। লোক-পরম্পরায় এই ব্যাপার মহমূদের গোচর হইবামাত্র তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং খালিফাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—'তুমি অবিলম্বেই ফর্দ্দুসীকে আমার সমীপে প্রেরণ করিবে।

খালিফা-সভায় ফর্দ্দুসী

আর যদি আমার আদেশের অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে সহস্র সহস্র হস্তী সমবেত হইয়া তোমার রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বোগ্‌দাদ নগর ধরাশায়ী করিবে।” বিচক্ষণ খালিফা এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না। তিনি পত্রের সম্যক প্রকারে প্রত্যুত্তর না লিখিয়া তাহার একপার্শ্বে ‘এ-ল ম’ এই তিনটি বর্ণ লিখিয়া পত্রখানি দূতদ্বারা গজনীতে ফিরাইয়া দিলেন।

খালিফের প্রতি মহমূদের আদেশ---উহার উত্তর

দূত গজনীতে প্রত্যাগমন করিলে মহমূদ তৎসমভিব্যাহারে ফদ্দ্‌সীকে আসিতে না দেখিয়া কোপে কম্পিত-কলেবর হইয়া, পত্রে খালিফার কোন ক্ষমা প্রার্থনা আছে কি না জানিবার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার পার্শ্বদেশে তিনটি মাত্র বর্ণ লিখিত আছে। এতদ্দেশীয় রাজপ্রথায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই নিকৃষ্ট লোকদিগকে প্রত্যুত্তরপত্রের পার্শ্বে লিখিয়া থাকেন। তদবলোকনে মহমূদের প্রজ্বলিত কোপানল চতুর্গুণ প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু পত্রের ভাবার্থ অবধারণে সভাস্থ সকলেই অসমর্থ হইলেন। চাটুকারগণ অনেকে ব্যঙ্গচ্ছলে অনেক কথা বলিল ; কিন্তু কিছুই স্থিরতর হইল না।

উত্তরের মর্ম্ম নির্দ্ধারণ

অবশেষে একজন সুচতুর যুবা কহিলেন—‘কোরাণের এক অধ্যায়ের শিরোভাগে ঐ অক্ষরগুলি দ্বারা হজরত মহম্মদের নীতি-জ্ঞানাত্মক একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত মহম্মদের জন্মাব্দে য়েমনের অধিপতি সুবিখ্যাত সারা মক্কার পৌত্তলিকতা উচ্ছেদমানসে সেনা নগরে এক মন্দির সংস্থাপন করেন। কোরিশনামা অন্য এক ভূপাল কর্ত্তৃক ঐ মন্দির বিনষ্ট করিবার জন্য মক্কায় বহুসংখ্যক সৈন্য, বহুশত হস্তী, অশ্ব,

পত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটন

উষ্ট্র প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর ঐ সকল সৈন্য বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত শত শত শ্রেণীবদ্ধ চটকদল প্রেরণ করেন। ঐ ক্ষুদ্র সৈন্য দলের চঞ্চুতে ক্ষুদ্রাকার লোষ্ট্র ছিল; পক্ষীরা সেই লোষ্ট্র সকল সমরস্থলে নিক্ষেপ করিবামাত্র সংগ্রামোন্মত্ত মাতঙ্গগণ ও অশ্বনিবহ অবিলম্বে রণস্থলমধ্যে নিহত হইল। খালিফা ঐ ভূপালের ঈশ্বরদত্ত দুর্গতির পরিচয় প্রদানার্থ আপনাকে 'এ-ল-ম' চিহ্ন দ্বারা সাবধান হইবার সঙ্কেত করিয়াছেন।" মহম্মদ খালিফাপ্রদত্ত উত্তরের এইরূপ মর্ম্ম অবগত হইয়া লজ্জিত হইলেন ও যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন।

ফর্দুসী গজনী হইতে প্রস্থান করিলে, রাজভৃত্য মহম্মদকে ফর্দুসী প্রদত্ত কবিতাগুলি প্রদান করে। কিন্তু মহম্মদ তৎকালে সেই কবিতাগুলির আর কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। কিয়ৎকাল পর মহম্মদ একদিন উপাসনা হেতু মসজিদে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, মন্দিরের প্রাচীরে এই কয়টি কথা লিখিত আছে—'সুলতান মহম্মদ জাবলিস্থানের রাজার যে বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় করিয়াছেন, তাহা সমুদ্রতুল্য দুস্তর কোনক্রমেই তাহার দিক নিরূপিত হয় না। আমি ঐ অগাধ সাগরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া কিছুই মণি আহরণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সমুদ্রের দোষ কি দিব—আমার কপালেরই দোষ!'

মন্দির গাত্রে সুলতানের প্রশংসাসূচক কবিতা

উল্লিখিত কবিতা পাঠ করিয়া সুলতান দয়ার্দ্রহৃদয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে, তাঁহার এক বোগদাদবাসী বন্ধুর নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—'হতভাগ্য ফর্দুসীকে বোগদাদে সাক্ষাৎ করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে

মহম্মদবন্ধুর পত্র ও ফর্দুসীকে গজনীতে পুনরানয়ন চেষ্টা

জানাইতেছি যে, ঐ বৃদ্ধ অথচ কবিকুলচূড়ামণি এক্ষণে অতি দুর-বস্থাপন্ন হইয়া এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং আপনার অন্যায়াচরণবশতঃ অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়া কবিতাদ্বারা অনেক শ্লেষোক্তি করিয়াছেন। মহাশয়, ঐ সদাশয় কবিগুণাকরের গুণ যুগান্তরেও বিস্মৃত হইবার নহে। আপনি ক্ষণকালমধ্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারের আদেশ করিয়াছেন! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়!' ঐ পত্র পাঠে মহমূদ অত্যন্ত পরিতপ্ত ও কুপিত হইয়া মন্ত্রীকে এরূপ অর্থদণ্ড করিলেন যে, তাহাতে তিনি নিঃস্ব হইলেন এবং ফের্দ্দৌসীকে গজনীতে পুনরানয়ন প্রত্যাশায় ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও অন্যান্য প্রচুর উপহার সহ দূত প্রেরণ করিলেন।

বৃদ্ধ কবির তুসনগরে প্রত্যাবর্ত্তন ও [illegible]

এদিকে, বৃদ্ধ কবি ফের্দ্দৌসী বোগদাদ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপন জন্মভূমি তুসে জীবন অতিবাহিত করিবার মানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন প্রাতঃ সমীরণ সেবনান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে একজন পথিক তাঁহার 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থের একটি শ্লোক গান করিয়া কহিল—

রাজা যদি হইতেন রাজার কুমার।
মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার॥

এই বাক্যে, তাঁহার যাবতীয় পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া গেল—তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—এবং তদবস্থায় তাঁহার আত্মা দিব্যলোকে গমন করিল। (১০২০ খ্রীষ্টাব্দ)।

এই দুর্ঘটনার পরদিনই মহমূদের দূত স্বর্ণমুদ্রা ও উপহারসহ তুসে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাঁহার উপহার লইবার পাত্র লোকান্তরে

গমন করিয়াছে! এই নিমিত্ত মহমূদ ফর্দ্দুসীর জন্য যে সমস্ত বিভব প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাহকেরা তৎসমুদয় তাঁহার দুহিতার সম্মুখে উপস্থিত করিল। এই রমণীও পিতার ন্যায় অত্যন্ত তেজঃশালিনী ছিলেন। যে পুরস্কারের অর্থনিমিত্ত তাঁহার পিতার কাল হইল, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে কোনমতেই সম্মতা হইলেন না!—অতিশয় ঘৃণাপূর্ব্বক তৎসমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ফর্দ্দুসীদুহিতার তেজস্বিতা।

মহমূদ ঐ অর্থ পুনর্গ্রহণ না করিয়া তদ্দ্বারা ফর্দ্দুসীর চিরাকাঙ্ক্ষিত তুসনগরের পুরোবর্ত্তী নদীর উপর সেতু ও বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

ফর্দ্দুসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

প্রবন্ধ-রত্ন

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অতিথি সেবা

'এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়'। এই জনপ্রবাদে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম—'করিতাম' বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এদেশে আতিথ্য-সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে।

ভারতবর্ষীয়গণের অতিথিসেবার বিশেষত্ব

পূর্ব্বে কোনও গৃহস্থের বাটীতে একটি অতিথি আসিলে অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না---বাটীতে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন, গৃহ-প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন, কি স্বপাকে খাইবেন, তাহা সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। গৃহ প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন শুনিলে যেন কৃতার্থ হইতেন এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোকজনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন পর্য্যন্ত, আপনারা কেহ জলগ্রহণ করিতেন না।

আজকাল আর ওরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন স্বপাকভোজী অতিথি, সহরের কথা দূরে থাকুক্, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হন না। আর যাহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থ তাদৃশ স্থলে বিরক্তি, সংগোপনে সতর্ক হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে—নিকটে দোকান, সরাই, সদাব্রত অথবা হোটেল আছে,—ইঙ্গিতক্রমে এরূপও বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভাল লোক আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে সম্মত হন না। এখনকার অতিথির মধ্যে অধিকাংশ লোকই উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সন্ন্যাসী বা সাধু; ইহারা সদাব্রতে পেট টানিয়া এবং গাঁজা খাইয়া বেড়ায়; ফল কথা, প্রকৃতরূপ অতিথিসৎকার কালক্রমে যে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। তবে, যত দিন একান্নবর্ত্তিতা থাকিবে, যত দিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্যচিন্তার উদ্বেগে এ দেশের লোকেরা উদ্বেজিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন আতিথ্য ব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না। পক্ষান্তরে এদেশের লোকেরা যতই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে, এবং পরস্পর অথবা আগন্তুক অপর জাতীয়দিগের প্রতিযোগিতায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইবে না, ততই আতিথ্য-ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান কালে অতিথির প্রতি ব্যবহার-- আতিথ্য ধর্ম্মের হ্রাস

কিন্তু এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই—এখনও অতিথি-সৎকার করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ধরা যায়—এখনও আমরা এই ধর্ম্মপালনের ফলভোগী হইতে পারি।

কর্ত্তব্য বুদ্ধির ক্ষীণ পরিচয়

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথিসৎকারের কথা মনে করিতেছি,

সে প্রকার অতিথি সচরাচর জুটে না। তিনি কোন পরিচিত বা ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন। তিনি কোন ভদ্রলোক—কার্য্যগতিকে অসময়ে তোমার বাটিতে উপস্থিত হইয়াছেন। মনে কর—বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার স্নান ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটা ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে তাঁহার জন্য কোন যোগাড় করিও। সকল কাজ চাকর চাকরাণীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুধ থাকে, তাহার কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়া গিয়াছে। অতিথির নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করিও না। কিন্তু যে দিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন, সে দিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা যেন অতিথির খাওয়াটি ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা করিও। যদি অতিথির সৎকার করায় বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগে কিছুমাত্র ত্রুটী না হয়, তবে অতিথি-সৎকারে সমগ্র ফললাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহারও উপভোগের ত্রুটী না হইয়া অতিথির সম্যক্ সৎকার হয়, সে বাটীতে মিত-ব্যয়িতার নিয়মগুলিও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না, এরূপ বলা যাইতে পারে।

বিশিষ্ট অভ্যাগতের পরিচর্য্যা

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা

করিও না। নিজের বিদেশ পর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে সেই বিষয়েই কথা কহিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উত্তম সৎকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

অভ্যাগতের সহিত আলাপ

কখন কখন এমন সকল লোককে অতিথি হইতে হয়, যাহারা স্থানমাত্রের অথবা দ্রব্যবিশেষের প্রার্থী হইয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন রীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি তাদৃশ অতিথির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যদি আমার দ্রব্যই খাইবে না, তবে শুদ্ধ আশ্রয় দিব কেন?—অথবা যদি সিধাই লইবেন না, তবে একটু দুধ কিংবা মৎস্য দিয়া কি হইবে? এই সকল লোক আতিথ্য-সম্পাদনে যে পুণ্য লাভ হয়, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই পুণ্যের প্রতি একান্ত লুব্ধ। কিন্তু লোভ মহাপাপ—পুণ্যের প্রতি যে লোভ, তাহাও পাপ। অতএব ঐ পুণ্যের লোভও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহার যেটি প্রয়োজন তাহাকে তাহাই দিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার ঘরে বসিয়া অতিথি আপনার দ্রব্য খাইবেন, ইহাতে লজ্জা বোধ করা রাজস-প্রকৃতির লক্ষণ—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক স্বভাবের লক্ষণ নয়।

স্থানমাত্র বা দ্রব্য-বিশেষের প্রার্থী অভ্যাগতের প্রতি ব্যবহার

তবে একটি কথা আছে, ওরূপ অতিথির নিকট স্বয়ং থাকিয়া আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। তাঁহার জন্য স্বহস্তে কোন যোগাড় করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই। তাঁহার পরিচর্য্যায় দাসদাসীর নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে অতিথির আজ্ঞা সকল সত্বরে পালন করিবার আদেশ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

অতিথি-সেবায় পরিচারক নিয়োগ

অতিথি-সেবা—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য দানধর্ম্মের সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মুষ্টিভিক্ষা দান অতি সৎকার্য্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। 'ভিখারীর শরীর সবল ও কর্ম্মক্ষম; অতএব তাহার ভিক্ষা করা উচিত নয়, তাহার খাটিয়া খাওয়াই উচিত'—এ সকল বিচার গৃহস্থকে করিতে হইবে না। উহা সমাজের বিচার্য্য বিষয়। তোমার দ্বারে যে ভিখারী আসিল, তুমি তাহার প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া এবং চাকর চাকরাণী কাহাকেও কটুভাষা কহিতে না দিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও সে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাউক। ঐ ভিক্ষা-দান কার্য্যটি বাটীর শিশুদিগের হাত দিয়া করানই ভাল।

গৃহস্থের দান—ভিক্ষা প্রদান

মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার চাঁদায় গৃহস্থকে অর্থদান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য, পুস্তকালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, পিতৃ-মাতৃ দায়ের জন্য, বারোয়ারির জন্য, দুর্ভিক্ষ পীড়া নিবারণের জন্য, গৃহস্থকে প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু দান করিতে হয়। আমার বিবেচনায় ঐ সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যাত করিতে নাই। সকলকেই কিছু কিছু দান করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে একটি কথা আছে—দিব বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়া অপেক্ষা বেশী দোষাবহ। বরং চক্ষুর্লজ্জা ত্যাগ করিয়া একেবারেই দিব না বলা ভাল, কিন্তু দিতে স্বীকার করিয়া কোন মতেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত নয়। যেটি দিবে বলিবে, সেটি ঠিক সময়েই যথা পরিমাণে দিবে। ফল কথা, দান ধর্ম্মের মূল সূত্র এই, দাতা এমন ভাবে দান করিবেন, যেন গ্রহীতার বোধ হয় যে, উনি দান করিতে পাইয়া আপনাকে উপকৃত এবং কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

অন্যবিধ দান

—০*০—

রোগীর সেবা

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ মমতা কম—স্বার্থপরতা বেশী—আত্মত্যাগশক্তি ম্লান—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত-জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

গৃহস্থের রোগি-সেবা

রোগি-সেবাপরায়ণ গৃহস্থের বিশেষ লক্ষণ

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল হয়, সে বাটীর অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি--

(১) সে বাটীতে গৃহোপকরণের মধ্যে এমন কতক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। যথা, জল গরমের পাত্র, ফ্লানেল এবং মলমল কাপড়ের টুক্‌রা, খল দাঁটি, হামান দিস্তা, মেজর গ্লাস, উষ্ণজলে না ফাটিয়া যায় এমন বোতল, ভাল নিক্তি, বেড্‌প্যান, থার্ম্মোমেটর এবং ঔষধের একটি বাক্স বা আলমারি।

(২) সে বাটীতে কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহার কোন পীড়া হইলে তাহা যতই সামান্য হউক, বাটীর কর্ত্তা তাহার তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হন।

(৩) সে বাটীতে যদি কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়, তবে বাটীর ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার জন্য বিশিষ্টরূপে আদিষ্ট হয়।

(৪) অধিক পীড়ায়, সমস্ত বাটী উপশান্তভাব ধারণ করে—কেহই কাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় না—কেহই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে না—বাটীর কেহই সশব্দে চলিয়া বেড়ায় না—ছেলেরাও আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলে।

(৫) রোগীর নিকটে থাকিবার জন্য পাহারা বদলের ন্যায়, দিবারাত্রির মধ্যে পারিবারিক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নিয়োগ হইয়া যায়। যাহারা সেবায় নিযুক্ত হয়, অপরে তাহাদিগের তৎকালীন করণীয় গৃহকার্য্য সমস্ত আপনাদের মধ্যে বিভাজিত করিয়া লয় এবং সমস্ত গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে—বাসনের বা অন্যবিধ গৃহোপকরণের কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না।

(৬) রোগীর পথ্য এবং ঔষধ যথা সময়ে প্রদত্ত হইতে থাকে—তাড়াতাড়িও নাই বিলম্বও নাই—বিন্দুমাত্র কোন বিপর্য্যয় নাই। বাটীর অনেকেই রোগীকে পথ্যাদি প্রদানে সক্ষম হয়।

(৭) রোগের লক্ষণ দেখা এবং চিকিৎসককে তাহা অবগত করান পরিবারের মধ্যে অনেকের সাধ্য হইয়া থাকে।

(৮) রোগের চিকিৎসায় ব্যয়কুণ্ঠতার নামগন্ধও থাকে না।

রোগি সেবা পক্ষে সম্মিলিত পরিবারের উপকারিতা

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কত দূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের অর্থ এবং মন এক হইয়া যায়।

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা, সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এই জন্য এমন ভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে, তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিলে—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে না কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শায়িত—তুমি রাত্রি দিন তাহার মলিন মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীরপাত করিতেছ। যদি শিশু তোমার দুগ্ধ খায়—তবে তোমার শোকবিহ্বল হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে, তুমি অধীরা হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাতে দূষিত স্তন্যরূপ বিষ পান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন শিশু নয়—তোমার ক্রন্দনের, হা-হুতাশের, উপবাসের ও অনিদ্রার প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই।

রোগি-সেবার প্রক্রিয়া

সতর্ক ব্যবহার ও ধৈর্য্যাবলম্বন

অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাত্রীটি নষ্ট করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন,—পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য, কৌতুক, বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে আমি তাহার পীড়ায় কিছুমাত্র ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়-বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেরও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা, তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে—অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্মম এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্য পরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

কৃত্রিম ব্যবহার দূষ্য

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে, তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর ও শান্ত-মূর্ত্তি হইয়া পীড়িত-রূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

সেবকের তন্ময়তা

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চঞ্চল লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চল-দৃষ্টি হইতে হয়। তাহার হৃদয়

সেবক ও সাধক—সেবকের স্থিরতা ও পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়া

ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয়, তাঁহার লক্ষ্য মধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়; তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না—রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্ম প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয়। রুগ্ণ ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারে না এবং চাহেও না; সুতরাং বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিবাই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই—কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই—গায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিশটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটি কপালে দিতে হইবে—ঠিক একটুকু চাপিয়া বা আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন,—পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু-হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হন।

পরিজনগণ উল্লিখিত ভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিশ, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহার বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটী হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি, বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া যেন বাটীর অপর লোকের, বিশেষতঃ বালকবালিকাদিগের

গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য

...ও সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। স্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ। তাহারা ছেলের বিষ্ঠামূত্র ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশ পালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মলমূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণ বটে, এবং তাহা করিতেও নাই; কিন্তু এ স্থলে ঘৃণা প্রদর্শন হইতেছে না, কেবলমাত্র সংস্রব দোষ নিবারণের উপায় বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর বয়স্কদিগের পীড়া শিশুদিগকে যত শীঘ্র আক্রমণ করে, শিশুর পীড়া বয়স্ককে তত শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারে না। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়াও সংক্রামকধর্ম্মী হইয়া থাকে। বৃদ্ধের পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংক্রামক।

...বেকর সতর্কতা।

বহুরূপা

টিক্‌টিকি কোন মতে প্রিয় পদার্থ নহে; সুতরাং তাহার বিবরণও কমনীয় নহে। কিন্তু এই টিক্‌টিকিজাতীয় বহুরূপা নামক এক প্রকার জীব আছে, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

টিকটিকি জাতীয় জীব বহুরূপা—ইহাদের বেশেষত্ব- বর্ণ পরিবর্ত্তন

বহুরূপার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে ইচ্ছানুসারে অনায়াসে আপন বর্ণ পরিবর্ত্তিত করিতে পারে; যাহাকে এই মাত্র ধূসরবর্ণ দেখিলাম, সে পুনঃ এতাদৃশ হরিদ্বর্ণ হয় যে, তাহা একজীবের বর্ণ বলিয়া কদাপি বোধ হয় না। সেই হরিদ্বর্ণ আবার এক মুহূর্ত্তমধ্যে উজ্জ্বল পীতবর্ণ হইয়া যায় এবং সেই পীতবর্ণ পুনর্বায় রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বহুরূপার স্বাভাবিক বর্ণ কি, তাহা বলা দুষ্কর। তবে স্বভাবতঃ তাহা পাংশুলবর্ণ থাকে; ইচ্ছা হইলে সেই পাংশু, হরিৎ, পীত, রক্ত, এবং অবশেষে কৃষ্ণবর্ণও হইতে পারে।

বহুরূপার অপর এক প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহার জিহ্বা একটি নলের ন্যায় এবং প্রায় ইহাদের শরীরের তুল্য দীর্ঘ। সচরাচর ঐ জিহ্বা মুখ মধ্যে আকুঞ্চিত থাকে; কিন্তু সম্মুখে কোন এক প্রকার কীট দেখিলে বহুরূপা ঐ জিহ্বা প্রবলবেগে ঐ কীটের উপর নিক্ষেপ করে। সেই নিক্ষেপে, জিহ্বা আট-অঙ্গুলি পরিমিত স্থান এত দ্রুত বিচরণ করে যে, দর্শক তাহার গতি পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে পারে না। এই জিহ্বা-নিক্ষেপ কদাপি ব্যর্থ হয় না। লক্ষিত কীটের দেহ জিহ্বা স্পর্শ করিবামাত্র জিহ্বা-নিঃসৃত রসে উহা

বহুরূপার জিহ্বা - খাদ্যসংগ্রহ প্রণালী

জড়ীভূত হইয়া যায়। তখন বহুরূপা জিহ্বা সঙ্কোচ করিলে, জিহ্বায় জড়ীভূত কীট-পতঙ্গগুলি মুখমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া উদরস্থ করে।

এই সকল কীটই বহুরূপার একমাত্র খাদ্য। এই নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টা তাহাদিগকে এমন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, তাহারা কীটদিগের ভ্রম জন্মাইবার নিমিত্ত যখন যে বৃক্ষশাখাদি বা অন্য কোন পদার্থের উপর অবস্থান করে, তখন সেই পদার্থের বর্ণ ধারণ করিয়া এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, তাহাকে তখন ঐ বৃক্ষশাখাদি হইতে পৃথক্ বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত, এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগের স্বভাবও এ প্রকার ধীর ও শ্লথ হইয়াছে যে, এক দণ্ডকাল অনিমিষনেত্রে ইহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিলেও ইহাদের দেহে কোনরূপ স্পন্দন দৃষ্ট হয় না; কেবল সময়ে সময়ে তাহাদের নয়ন সঞ্চালিত হইয়া কোথায় কি কীট পতঙ্গাদি উড়িতেছে তাহারই অনুসন্ধান করিতেছে বোধ হয়।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিকৌশল — বহুরূপার বর্ণবৈচিত্র্য ও স্বভাব

এই নয়ন-সঞ্চালনও অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহা অন্য জীবের ন্যায় একবারে উভয় চক্ষুতে সম্পন্ন হয় না; প্রত্যুত, প্রত্যেক চক্ষু ইচ্ছানুসারে বিভিন্নদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে; ফলে, যখন বাম চক্ষু বাম পার্শ্বে দেখিতেছে, তখন দক্ষিণ চক্ষু, হয় পশ্চাদ্ভাগে নতুবা ঊর্দ্ধভাগে অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে দেখিতে পারে। এই কৌশলে, বহুরূপাদিগের দুই চক্ষুতে বহুল চক্ষুর কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। বিশেষতঃ, ঐ চক্ষু উজ্জ্বল হইলে, তাহার ঔজ্জ্বল্যে কীট-পতঙ্গাদি ভীত হইতে পারিত; এই নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টা তাহা এ প্রকার পল্লবে আবৃত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার তারকার এক ক্ষুদ্র ছিদ্র ভিন্ন অপর সকল বহুরূপার দেহের ত্বক্ সদৃশ পরিবর্ত্তনীয় বর্ণের চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, অথচ তাহাতে দৃষ্টির কোন বিঘ্ন হয় না।

নয়ন-সঞ্চালন প্রক্রিয়া- ইহার কৌশল

বহুরূপার পদও অসাধারণ। তাহার প্রত্যেক পদে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র না থাকিয়া চর্ম্মে আবৃত হইয়া দুইটি গুচ্ছ হয়। তাহার তিন অঙ্গুলিবিশিষ্ট গুচ্ছটি পুরোভাগে, ও অপর দুই অঙ্গুলিবিশিষ্ট গুচ্ছটি পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত থাকে। এইজন্য বহুরূপা বৃক্ষশাখা ধরিতে বিশেষরূপ সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত, শাখায় দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকিবার পক্ষে ইহার লাঙ্গুলও বিশেষ সাহায্য করে। এই লাঙ্গুল অতি নমনীয় এবং যে বস্তুর উপরে জড়িত করা যায়, তাহা দৃঢ়রূপে ধরিতে সমর্থ হয়। অশ্ব, গো, কুক্কুরাদি জীবের লাঙ্গুলে এ প্রকার শক্তি নাই। টিকটিকিতেও এই প্রকার ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না।

বহুরূপার পদ ও লাঙ্গুলের গঠন-কৌশল

বহুরূপার প্রধান বাসস্থান ভারতবর্ষ। আসিয়া প্রদেশের অপরাপর উষ্ণপ্রধান স্থানেও ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুরূপা দেখিতে সুন্দর নহে; পরন্তু, শ্লথগতি ও স্থূলবুদ্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের পক্ষ নাই—অথচ ইহাদের প্রধান খাদ্য সুপক্ষ-বিশিষ্ট অত্যন্ত দ্রুত উড্ডয়নশীল চঞ্চলস্বভাব মশা ও মক্ষিকাদি। এই সকল কীট পতঙ্গাদি নষ্ট করিয়া বহুরূপা আমাদের বহু উপকার করে। এই সৎকর্ম্মে সামান্য টিকটিকিও ইহার সহযোগী এবং তাহারা ঘৃণিত ও কদর্য্য হইয়াও অহরহঃ আমাদের শত্রু বিনষ্ট করিতেছে। তাহাদের অভাবে, মক্ষিকা ও মশার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিত।

বহুরূপার বাসস্থান—ইহাদের উপকারিতা

আমার বাল্যশিক্ষা

(রাজনারায়ণ বসু)

পবিত্র বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে যে অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রথম শ্লোক আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্য্যরূপে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা সকালে বালকদিগকে মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা আরম্ভ করান হইত। আমার স্মরণ হয়, আমার জ্যেঠা মহাশয় মধুসূদন বসু, আমাকে তাহার

চাটুর উপর বসাইয়া আগে 'গাড—ঈশ্বর, গাড—ঈশ্বর' মুখস্থ করাইতেন।

গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা।

আমি যে গুরুমহাশয়ের কাছে পড়িতাম, তিনি বর্দ্ধমানের একজন উগ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি উগ্রস্বভাব ছিলেন না; কিন্তু আমি তাঁহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যদি 'রাজনারায়ণ' বলিয়া ডাকিতেন, তখনই আত্মাপুরুষ শুখাইয়া যাইত।

কলিকাতা আগমন, ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ, সেকালের শিক্ষক

সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে শিক্ষার্থে কলিকাতায় আনেন। আসিয়া প্রথমে এক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখিবার জন্য শম্ভুমাষ্টারের স্কুলে ভর্ত্তি করেন। এই স্কুল বোবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শম্ভুমাষ্টার অতি অল্পই ইংরাজী জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাঁহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ করিতেন। পশ্চাতে গ্রীক সাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রীক সাহেব শম্ভুমাষ্টার অপেক্ষাও ইংরাজী অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটি ইংরাজ থাকিলে যেমন স্কুলের গৌরব বাড়ে এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল করিলে ইঁহারা 'ফেরুল' দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেক দিন অবধি 'ফেরুল' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাই; পরে এক দিন লাটিন ভাষার অভিধান দেখিতে দেখিতে জানিতে পারিলাম, উহা একটি দীর্ঘ বাট বিশিষ্ট কাঠের চাকতি—রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরাজদিগের দ্বারা ছাত্রদিগকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শম্ভু মাষ্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম 'স্কুল সোসাইটিস্ স্কুল' ছিল।

'স্কুল সোসাইটি' দ্বারা সেকালে অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রকাশিত 'রিডার' গুলি অতি উত্তম পুস্তক ছিল। স্কুলের প্রকৃত নাম 'স্কুল সোসাইটিস্ স্কুল' হইলেও, হেয়ার সাহেব উহার কর্ত্তা ছিলেন। সাধারণ লোক 'হেয়ার সাহেবের স্কুল' বলিয়া ডাকিত।

হেয়ার স্কুল ও হেয়ার সাহেব

যাহাতে বাঙ্গালী বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান্ হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটী হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গাত্র, তোয়ালিয়া দ্বারা জোরে রগ্‌ড়াইয়া দিতেন; যদি ময়লা বাহির হইত, তাহা হইলে তাহাকে দুই এক ঘা বেত মারিতেন; তিনি বালকদিগকে গাত্র পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান দিতেন। প্রতি শনিবার তাঁহাকে হাতের লেখা দেখাইতে হইত। তিনি লিখিবার বিষয় যে সকল উপদেশ দিতেন, সেইরূপ না লিখিলে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। একটি অক্ষর বড় একটি অক্ষর ছোট হইলে তিনি বড় রাগ করিতেন। আমার ভাগ্যক্রমে কখন তাঁহার নিকট হইতে বেত খাই নাই। কিন্তু আমি তাঁহার বেত্রচালনৈষণা নিবারণ করিবার জন্য, বেত্র খাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প আমার তখনকার ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার ঐ গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। যখন আমি এ কার্য্য করি, তখন আমার বয়স এগার কি বার; এ কার্য্য জন্য আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষণে তাহা আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

হেয়ার সাহেবের ছাত্র প্রীতি

আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি।

হেয়ার সাহেব আমাদিগের বক্তৃতাশক্তি ও রচনাশক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ক-সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে, 'সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ কি না'—এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত ভাল লাগিত না, তথাপি আমার প্রবন্ধে তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনাশক্তি ও নিঃস্বার্থভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব, আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহপূর্ব্বক আমাকে বলিতেন যে 'কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ'।

'বিতর্ক সভা'—প্রবন্ধ রচনা

একবার জ্বর হইলে, আমি তাঁহাকে সংবাদ না দেওয়ায় তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সংবাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাকে ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গে লইয়া দেখিতে আসিতেন।

হেয়ার সাহেবের ছাত্র-সেবা

আমি যখন হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদিগের তিন জন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র; তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইঁনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বাটী কলিকাতায় চাঁপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেড্ মাষ্টার ছিলেন। দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদের মনে জ্ঞান ও অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন।

হেয়ার স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক—তাঁহাদের কৃতিত্ব

তিনি আমাদের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন। উমাচরণ আমাদিগের নিকট স্কটের 'আইভান হো', পোপের কবিতাবলী এবং অন্যান্য গদ্য পদ্য কাব্য, উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিতেছিলেন। তিনি যেরূপে ঐ সকল কাব্য পড়িতেন, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদের নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত।

ইংরাজী সাহিত্য-শিক্ষা

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত-বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে গণিতাতঙ্ক বলা যাইতে পারে। উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কত না কষ্টই দিয়াছি। এই রাধামাধব বাবুর সহিত পরে মেদিনীপুরে দেখা হয়; তখন আমি মেদিনীপুর জেলাস্কুলের হেড মাষ্টার। তিনি পূর্তবিভাগের পরিদর্শকপদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

গণিত শিক্ষা

হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময়, আমি হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র, প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে যেমন সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুরমত থাকিত। এই সংবাদপত্র পরিচালনে আমার সমাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিত। ঐ সংবাদপত্রের নাম 'ক্লাব মেগেজিন' ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লাবের নামে রাখিয়াছিলাম। নানটি পুরাতন ইংরাজী অক্ষরে কাগজের শিরোদেশে

ছাত্রাবস্থায় পত্রিকা সম্পাদন

জাজ্বল্যমানরূপে লেখা হইত। এই কাগজ দেখিয়া ভগবচরণ বলিয়াছিলেন যে, উহা যেন নেপোলিয়নের বাল্যকালের তুষারদুর্গ নির্ম্মাণের ন্যায়। কিন্তু আমি যেরূপ বড় লোক হইব, তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই।

চন্দ্রলোক

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়—বিচ্ছেদে, মিলনে—অলঙ্কারে, খোসামোদে—তিনি উলটি-পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা ইত্যাদি সাধারণ-ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; সুধাকর, হিমকর-করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে বাঙ্গালী বালকের মন মুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্যকুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞানদৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই।

বঙ্গ সাহিত্যে চন্দ্রদেব

যখন অভিমন্যুশোকে ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন।

বিজ্ঞানে চন্দ্র

আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোণার মানুষ, সোণার থালে সোণার মাছ ভাজিয়া সোণার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে কেহ যায় না। এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে সৌর জগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র

চন্দ্র ও পৃথিবী যুগল গ্রহ - তুলনা

যুগল-গ্রহ। উভয়ে এক পথে একত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের ৭৫ গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে সেই যুক্ত আকর্ষণের কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ কারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠক বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী, ইহার ব্যাস ১০৮০ ক্রোশ, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র

চন্দ্রের দূরত্ব

ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এপাড়া ওপাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে

যে, তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে দুই হাজার চারিশত গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্র দর্শন

এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ম্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময় আগ্নেয়গিরি-পরিপূর্ণ জড়পিণ্ড, কোথাও অনুন্নত পর্ব্বতমালা—কোথাও গভীর গহ্বর-রাজি। আমরা পৃথিবীতে দেখি যে, যাহা রৌদ্র-প্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস-বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, যে স্থান উন্নত সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে গহ্বর অথবা পর্ব্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সেই স্থানগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি, সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থানগুলি কলঙ্ক—অথবা 'মৃগ'—প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই 'কদম তলায় বুড়ী চরকা কাটিতেছে।'

চন্দ্রপৃষ্ঠের পরিচয়

চন্দ্রের বহির্ভাগে এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহাতে চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার পর্ব্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বয় অন্যূন ১০৯৫ চান্দ্র-পর্ব্বতের

চান্দ্রপর্ব্বতাবলীর উচ্চতা

উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্ব্বতের নাম রাখিয়াছে 'নিউটন', তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ ফীট। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত-শিখর পৃথিবীতে আন্দিস্ ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশদ্ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায় চান্দ্র-পর্ব্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় 'নিউটন' যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশদ্ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্রপর্ব্বত যে কেবল আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নেয়পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয়পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্র সকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল-প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগবগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবর-বিশিষ্ট,—কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়।

চন্দ্রলোকে আগ্নেয়গিরি

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যতদূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই—যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জল-বায়ু থাকে, তবে, সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল-বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

চন্দ্রলোকে জীব আছে কি না?

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্ত্তৃক

সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে; তৎপরে চন্দ্র-শরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্ব্বমত উজ্জ্বল বোধ হইবে না, কেননা, বায়ু আলোকের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজাঃ হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু একপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্ব্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন একপ হইত না।

চন্দ্র বায়ুশূন্য

চন্দ্রে যে জল নাই তাহারও প্রমাণ আছে; কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণরেখা-পরীক্ষক-যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জল বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

—জলশূন্য

সুতরাং জীবশূন্য

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সংবর্ত্তন করে; অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষ মাস হইতে জৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ পৌষ মাসে দিন ছোট, জৈষ্ঠ মাসের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা বড় হইলেই এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি চন্দ্র কি

চন্দ্রের উত্তাপ—তাহার পরিমাণ

ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে — তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল, বায়ু, মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই ; তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়, অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবার সম্ভাবনা। লর্ড রস্ চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ যে, তত্তুলনায় যে জল অগ্নি সংস্পর্শে ফটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না — মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি 'শীতরশ্মি,' 'হিমকর' 'সুধাংশু' ? হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয় ?

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ পাষাণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, বৃষ্টিশূন্য,—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুণ্ড তুল্য এই চন্দ্রলোক।

চন্দ্রলোকের প্রকৃত পরিচয়

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে- বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

কাব্য ও বিজ্ঞান

গগন-বিহার

—:*:—

মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন-পর্য্যটন করে। কিন্তু, পাঠক-দিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্য্যটন-সুখ ঘটিবে, এমন বোধ হয় না।

বায়ু সমুদ্র

এজন্য গগন-পর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এ স্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয় পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্রবিশেষ। জল-সমুদ্র হইতে তাহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়ু সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোত প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চে গিয়াই মেঘ সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে

পৃথিবীর বাষ্পীয় আবরণ

আচ্ছন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূলোক আবৃত। যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়—পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্র-প্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতিঘাতী বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই; আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ, পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া মেঘময় জগতের উপরে স্থিত

হইয়া দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরি আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা

আকাশের বর্ণ

আশ্চর্য্য! আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্র সকল প্রচণ্ড জ্বালাবিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেননা, এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশ অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু।

সকলেই জানেন, সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করিলে দেখা যায়—সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু,

আকাশের নীলিমা

সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধবর্ণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোকরেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি, অন্ধকার দেখি না। কিন্তু যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়, আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য ঊর্দ্ধলোক গাঢ়নীলিম।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয়—

মেঘলোক

মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত, কেহ যেন

হীরকনির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে—কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে।

রন্ধ্রপথ, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত

মস্যুর কপ্‌ বিল্‌ একবারে একটি মেঘগর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠে বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বতমধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযানও মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ পথে গমন করিয়াছিল। এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য, ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ একদিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রি সমাগম দেখিয়া আবার ততোধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে, এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয়বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে পৃথিবীর দৃশ্য

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়। সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘও যেন সকলই অস্বচ্ছ, সকলই সমতল ভূমিতে চিত্রবৎ দেখায়! নগরসকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত-সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযানসকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাহারা লণ্ডন বা প্যারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই।

গ্লেসর সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডনের উপর উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরীসকলের রাজপথস্থ দীপমালা অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বত আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। সিমলা, দারজিলিং প্রভৃতি স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এইজন্য হিমালয় তুষার-মণ্ডিত। ব্যোমযান আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান করিলেও, ঐ রূপ হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়।

ঊর্দ্ধে তাপের তারতম্য। তাপের অল্পতা

তাপ, তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত—মনুষ্য শোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২১২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়, ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়।

ঊর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমিতে যেমন প্রখর, ঊর্দ্ধে ততোঽধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতি ক্ষীণ—অল্প পরমাণু। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তুলার ভারে নিম্নস্থ বস্তার তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ু গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এক ইঞ্চ দীর্ঘ প্রস্থ ভূমির উপর ভারের পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর—'অগাধ জলসঞ্চারী' মৎস্য উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত হয় না কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তরসমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তরসকল ঘনীভূত—যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইয়া থাকে। গগন-পর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা অনুসারে পোনে

তাপাভাবের কারণ বায়ুর চাপ

চারি মাইল ঊর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে সমুদয় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়।

দুই একবার গগনমার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সব কষ্ট বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন; কিন্তু ছয় মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ঊনত্রিশ সহস্র ফীট উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ অথবা ঘড়ির কাঁটা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিয়াছিলেন, যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন তখনও সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না। তাঁহার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন; গাত্রচালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল যেন হস্তপদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল—ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল এবং দৃষ্টি একবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের 'সারথি' রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

উপরে বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতিকূল—গ্লেশর সাহেবের অভিজ্ঞতা

—০◆০—

দেব-মন্দির

[দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ মহারাজ মানসিংহকে বঙ্গের উপদ্রবশান্তির জন্য প্রেরণ করেন। পাটনা অঞ্চলে উপদ্রবশান্তি করিয়া পরবৎসর তিনি উৎকল প্রদেশে কতলুখাঁর বিদ্রোহ দমন জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলেন যে কতলু খাঁ মান্দারণের অনতিদূরে সসৈন্যে আসিয়া দেশ লুণ্ঠন করিতেছে। শত্রুগণের প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য মানসিংহ উদ্বিগ্ন হইলে, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ মাত্র এক শত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে শত্রু শিবিরোদ্দেশে গমন করেন। কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিশীথে মান্দারণ দুর্গের সন্নিকট প্রান্তর মধ্যে শৈলেশ্বরের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় জগৎসিংহের সহিত গড়মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা ও তাঁহার দাসী বিমলার সাক্ষাৎ হয়। গ্রন্থকারের "দুর্গেশনন্দিনী" নামক গ্রন্থ হইতে প্রথম অধ্যায় বর্ণিত এই নৈশসাক্ষাৎকার দৃশ্যটি উদ্ধৃত হইল।

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল. ক্রমে নৈশ-গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

মান্দারণ পথে অশ্বারোহী

অল্পকালমধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্যপথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময় একবার বিদ্যুৎপ্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির।

দেব মন্দির

কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দ্বার রুদ্ধ; হস্তমার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবলবেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়মধ্যবাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের প্রতি অমর্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক ততদূর করিলেন না। তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা

মন্দির মধ্যে প্রবেশ

অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি, মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকা বেগে প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল।

মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া, নির্ভীক যুবাপুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন,—"মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না, কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কার-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকা প্রবেশরোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও; রাজপুতহস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

উপবেশন

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যে-ই হই, আমাদিগের আত্ম-পরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

অভয়-দান

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অদ্ধ-মূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্ম আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে আমাদিগের বাহক, দাসদাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।" রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকাবৃষ্টি নিবারণ হইলে, যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্ম নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইব।"

এই কথা শুনিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয় গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে; জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্ম সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দির-রক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারো-দ্ঘাটন না করিয়া প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন

মন্দিরের রক্ষক

দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না ; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রার লোভসংবরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত পাঁচ ভাবিয়া মন্দির-রক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুইজনমাত্র কামিনী। যিনি

দীপালোকে রমণীদ্বয়

নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু, তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণ পারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহ জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীনবংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন, অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না। বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশদ্বর্ষ বোধ হইবে। সহজেই যুবাপুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয়মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী।

যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপতিত

অশ্বারোহী

হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে, শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে, অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃটসম্ভূত নবদূর্ব্বাদলতুল্য, অথ

তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি, বসন্তপ্রসূত নব-পত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘকরে দীর্ঘ বর্শা ছিল, মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক, কর্ণে মুক্তা সহিত কুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয় পক্ষেই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে উৎসুক হইলেন না।

সমুদ্রতটে

[রসুলপুরের নদীর মোহনার নিকট তীরে নৌকা বাঁধিয়া যাত্রিগণ রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব হইলে নবকুমার নামক এক যুবক-যাত্রী, কাষ্ঠান্বেষণ জন্য বহির্গত হইয়া নদীতট হইতে ক্রমেই দূরে আসিয়া পড়িল। এদিকে, সমুদ্র হইতে হঠাৎ প্রবল জোয়ার আসিয়া প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত দ্বারা যাত্রীসহ তীরস্থ নৌকা তীরবেগে ঊর্দ্ধমুখে লইয়া গেল—মাঝিরা বহু চেষ্টা করিয়াও নৌকার বেগ রোধ করিতে পারিল না। নবকুমার তীরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নৌকা প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল দেখিতে দেখিতে রাত্রি সমাগত হইল—নবকুমার নিতান্ত ক্লান্তদেহে এক বালুকাস্তূপে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। গভীর রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে নবকুমার দূরে এক বালুকাস্তূপশিখরে উজ্জ্বল আলোকশিখা দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল-- এক শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃত রুদ্রাক্ষমালা-পরিশোভিত কাপালিক, এক ছিন্নশীর্ষ পূতীগন্ধময় শবে আরোহণ করিয়া ধ্যানস্থ আছেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে কাপালিক, নবকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে তাঁহার দূরস্থিত পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন এবং সঞ্চিত ফলমূলাদি আহার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া কহিয়া গেলেন—'নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান কর—ব্যাঘ্রাদির ভয় করিও না। যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত তুমি এই স্থানে অবস্থান করিবে।' নবকুমার সেই পর্ণকুটীরে একক রাত্রি যাপন করিল।

"কপালকুণ্ডলা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বর্ত্তমান প্রবন্ধে, ইহার পরবর্ত্তী দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে]

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ কাপালিকের সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বন-মধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে; জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ, যতদূর দেখা গিয়াছে, ততদূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক

নবকুমারের দ্বিধা ও সঙ্কল্প

আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এদিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধনে সমর্থ—এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্প পরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

আহার অন্বেষণ

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু। তদ্দারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন।

ক্ষুধা নিবৃত্তি

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প; অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছুদূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন তাহা

পথভ্রান্তি

স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্ত-বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুতা হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন।

অনন্ত সমুদ্র

ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানে সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিগ্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

প্রদোষে অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবেক। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের

দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুলফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য, বাহুযুগলের বিমল-শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদিসাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমধ্যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দ-শরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল;—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন অনিমেষ লোচনে বিশালচক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশিত হইতেছিল।

নবকুমার—নিস্পন্দ

অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া

রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

রমণীর প্রশ্ন

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ"?—এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল! সাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।

কণ্ঠধ্বনির ক্রিয়া

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস"। এই বলিয়া তরুণী চলিল; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। একস্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে, বনের অন্তরালে গেলে আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর!

রমণীর অনুসরণ—কুটীর সম্মুখে

চিতোর

[গ্রন্থকার, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণকালে দৃষ্ট স্থানসমূহের বৃত্তান্ত, তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইতেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ, সেই পত্রাবলী বা 'প্রবাসের পত্র' হইতে গৃহীত]

(নবীনচন্দ্র সেন)

চিতোরের কথা

এই পত্রে চিতোরের কথা লিখিব। কারণ, চিতোরের কথা তুমি শুনিতে বোধ হয় নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছ। কিন্তু কি লিখিব? চিতোরের নাম করিতেই আমার হৃদয় কি শোকের ও স্মৃতির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহা বলিতে পারি না।

নিশীথ সময়ে চিতোর ষ্টেসনে উপস্থিত হই। আমাদিগকে ডাক-বাঙ্গালা দেখাইয়া দিবার জন্য, ষ্টেসনে একটি লোক চাহিলাম। শুনিলাম যে, এই অল্প পথটুকু যাইতেই পথে এত 'ভেঁড়িয়া' (নেকড়ে বাঘ) যে, গলায় কামড়াইয়া ত ধরেই, তাহা ছাড়া, ছাড়েও না। কেহ প্রাণান্তে যাইতে স্বীকার করিল না। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, কি বীরভূমি, কি অরণ্য ও কাপুরুষের বাসভূমি হইয়াছে। কাজে কাজেই সে রাত্রি, ষ্টেশনের মেজেতে পড়িয়া কাটাইলাম। প্রাতে চিতোরস্থ 'হাকিমে'র নিকট হইতে হস্তী এবং 'পাশ' লইয়া আমরা দুর্গ দর্শন করিতে যাই। দুর্গপদমূলে এখনও একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামটি পার হইয়া আমরা চিতোরশৈলে আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। আরাবলী গিরিশ্রেণী হইতে একটি পর্ব্বত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাই চিতোরদুর্গ। অতি প্রশস্ত পথ, ঘুরিয়া শৈলশিখরে উঠিয়াছে। পর্ব্বতটি রাজগিরির পর্ব্বতের মত প্রস্তরময়। ক্রমে পদ্মদ্বার, হনুমানদ্বার, গণেশদ্বার, রুটি ঝুলনদ্বার, সূর্য্যদ্বার, সর্ব্বশেষে পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা কাল আরোহণের পর সানুদেশে উপস্থিত হই। সানুদেশ উত্তর দক্ষিণে তিন মাইল দীর্ঘ, এবং এক মাইল সমতলভূমি। ইহার উভয় পার্শ্ব হইতে মধ্যস্থল ঈষৎ নিম্ন। তাহাতে নানাস্থানে জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রশস্ত সানুদেশ বেষ্টিয়া দুর্গ-প্রাচীর এবং প্রাচীরের মধ্যে লক্ষ বীরপুরুষের পুণ্যধাম চিতোর নগর অবস্থিত ছিল। এখন তাহা ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। চিতোর এখন একটি মহাশ্মশান। এখনও স্থানে স্থানে তৈলকুণ্ড, ঘৃতকুণ্ড ইত্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় তাহা পূর্ণ রাখা হইত। হায়! হায়! আজ সেই বীরনগর, সেই বীরপুরুষ সকল কোথায় গেল?

চিতোর দুর্গ

আমরা প্রথমে মাতা পদ্মিনী দেবীর আবাস স্থান দেখিতে যাই। শুনিলাম, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সজ্জন সিংহ এক জন প্রকৃত সজ্জন ছিলেন। তিনি চিতোরের ঐতিহাসিক স্থানগুলির পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সজ্জন সিংহ পদ্মিনীর আবাসস্থানের ভিত্তি খুঁজিয়া কয়েকটি দেওয়াল তুলিয়াছেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। অট্টালিকাশিরে স্ফটিকের নক্ষত্র, সতীত্বের ধ্বজার মত, সূর্য্যালোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সরোবরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল গৃহ। পদ্মিনী দেবী তাহাতে ক্রীড়া করিতেন। যে সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্বমাত্র দিল্লী উন্মত্ত করিয়াছিল, সেই ঘোরতর শোক নাটক ঘটাইয়াছিল, যাহার জন্য এত বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উপবীত পরিমাণে ৭৪॥০ মণ হইয়াছিল,—সেই সৌন্দর্য্যের একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন চিতোরে বিদ্যমান রহিয়াছে!

পদ্মিনী দেবীর আবাস-স্থান

পদ্মিনীর মহল দর্শন করিয়া আমরা 'কালী মাইর' মন্দির দেখি। তাহার পর, মীরা বাই এর নির্ম্মিত মন্দির দর্শন করিয়া, আমরা কুম্ভরাণার কীর্ত্তিস্তম্ভে আরোহণ করি। এই স্তম্ভটি আমার কাছে সকল প্রশংসিত, কুতুবমিনার বা পৃথিরাজের স্তম্ভ অপেক্ষা অধিক মনোহর বোধ হইল। স্তম্ভটি উপর্য্যুপরি নয়টি প্রকোষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত। কুতুবমিনারে ক্রমাগত কেবল সোপান বাহিয়া উঠিতে হয়। এই স্তম্ভের এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে উঠিয়া, প্রকোষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পর আবার সোপান আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের প্রাচীরে এক একটি দেব দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দিল্লীশ্বরকে

মীরাবাই স্থাপিত দেবমূর্ত্তি রাণা কুম্ভের কীর্ত্তিস্তম্ভ

উপর্য্যপরি পরাজয় করিয়া, মহাবীর কুম্ভরাণা এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর যে স্থান দর্শন করিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। স্থানটির নাম গোমুখী। গিরিপার্শ্বে দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ একটি অতি সুন্দর কক্ষ। তাহার পশ্চাৎ পার্শ্ব দিয়া, চন্দ্রশেখরের মন্দাকিনীর মত, দুইটি নি[illegible]-ধারা প্রবাহিত হইয়া সম্মুখস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত সরোবরে পড়িতেছে। নির্গমপথ বন্ধ করিলে সরোবরটির মুখে মুখে জল হয়। সমস্ত স্থানটি বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। শীতল, নির্জ্জন এবং শান্তিপ্রদ এমন স্থান আমি আর যেন দেখি নাই। রাজপুরী হইতে একটি গুপ্তপথ, পর্ব্বতের অভ্যন্তর দিয়া এখানে আসিয়াছে। রাজমহিষীরা এই পথ দিয়া আসিয়া অবগাহন করিতেন এবং দেবদেবীর পূজা করিতেন। মূর্খ স্থান-দর্শক আমাদিগকে বলিল, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে "জোহর" হইত; যুদ্ধাবশেষে ইহাতেই বীরনারীরা পুড়িয়া মরিতেন। আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম না। অনেক জিজ্ঞাসার পর বলিল, রাজপুরীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখ আছে। আমরা উদ্ধশ্বাসে সেখানে গেলাম। ইহা টড সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে মিলিল।

গোমুখী

এই সেই পর্ব্বতাভ্যন্তরীণ কক্ষের পথ, যাহাতে সহস্র সহস্র বীরনারীরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, জগতের বিস্ময়কর সতীত্বের এবং সাহসের জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। শুনিলাম, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এই পবিত্র স্থানকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম এবং ললাটে ইহার ধূলা মাখিলাম। এইটি আমাদের একটি প্রকৃত মহাতীর্থ।

জহর-স্থান

যদি এই চিতোর ইংরাজদিগের কোনওরূপ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র
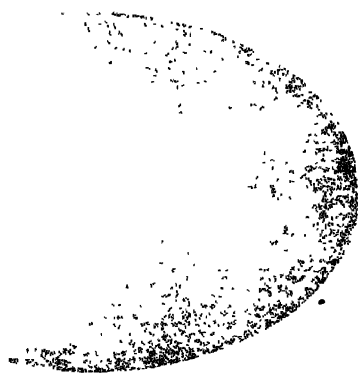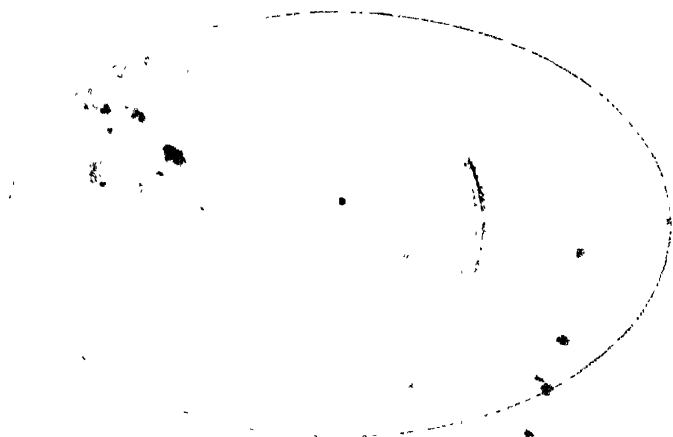
হইতে, আজ সেই পদ্মিনীর পবিত্র আবাস-গৃহ, সেই রাজপুরী, আমরা একটি বৃহৎ উদ্যানে বিরাজিত দেখিতাম। সেই পবিত্র জোহর-কক্ষ, আজ শত আকাশ-গবাক্ষে আলোকিত হইত, কক্ষটি ঐতিহাসিক চিত্রে সজ্জিত হইত। আমরা চিত্রে দেখিতাম, সময়ে সময়ে কিরূপে সহস্র সহস্র বীরনারীরা অগ্নি প্রবেশ করিতেছেন; দেখিতাম, একস্থানে চিতোরেশ্বরী কাণপুরস্থ সেই স্বর্গীয়া দেবীর ন্যায় দাঁড়াইয়া, অধোবদনে রোদন করিতেছেন। চিতোরের অঙ্গে অঙ্গে তাহার ঐতিহাসিক গৌরব সকল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। তুমি জান, প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন দিল্লী জয় করিয়া তিনি চিতোর অধিকার করিতে না পারিবেন, ততদিন তিনি তৃণে ভিন্ন শয়ন করিবেন না, পত্রে ভিন্ন আহার করিবেন না। শুনিলাম, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এখনও স্বর্ণ-শয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া শয়ন করেন, স্বর্ণ-পাত্রের নীচে পত্র রাখিয়া আহার করেন। সেই বীরপ্রতিজ্ঞা এক্ষণও তাঁহারা ভুলেন নাই। তথাপি, চিতোরের পদ্মিনীর, চিতোরের প্রতাপসিংহের, প্রাণ-প্রতিম চিতোরের আজ এই অবস্থা! এটি যে চিতোর, তাহা পথিককে বলিয়া দিবার জন্য একটি অঙ্গুলিনির্দ্দেশমাত্র কোথাও নাই। আছে—ইতিহাসে আছে! 'রক্তধমনীবিশিষ্ট প্রস্তররাশিতেও যেন সেই বীরপুরুষদের শোণিতধারা বর্ত্তমান আছে'। আছে বলিয়াই আমি দরিদ্র দুর্ব্বল বাঙ্গালী এই মহাতীর্থ দর্শন করিতে চিরজীবন লালায়িত ছিলাম। আজ দেখিয়া জীবন সার্থক মনে করিলাম।

পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষণে নিশ্চেষ্টতা

প্রবন্ধ-রত্ন

তৃতীয় খণ্ড

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র

(চন্দ্রনাথ বসু)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনাস্থা

যখন স্কুল ও কালেজে পড়িতাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের "দ্বিতীয় ভাষা" ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজীওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে; যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ আদর, তখন বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বহি লেখা কেন! কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কিছু ভাবি নাই! মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম, তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই! বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিনকতক পরে শুনিলাম, বঙ্কিমবাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটা অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিমবাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল, বুঝি বা বঙ্কিমবাবুর জন্য কাহারও কাহারও গাত্রদাহ আরব্ধ হইয়াছে। তখন 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' কিনিয়া পড়িলাম। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের 'আইবান হো' পড়িয়া লিখিত। অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—"দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে 'আইবান হো' পড়ি নাই"। আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমিই হিন্দুপেট্রিয়টে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নিন্দা করিয়াছিলে?" আমি বলিয়াছিলাম, "না, হিন্দুপেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল, তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন,—"সমালোচনা অন্যথা হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও

বঙ্কিমচন্দ্র—উপন্যাস রচনা

অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন আমি 'আইবান হো' পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।"

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার 'বঙ্গদর্শনের' গ্রাহক হইলাম। 'বঙ্গদর্শনে' 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয়। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন—'ঐ আবার কুন্দনন্দিনী একটা কি বাহির হইতেছে?' তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মনঃকষ্ট হইয়াছিল—সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধ হয় কখনও যাইবে না। তেমন যশস্বী প্রতিভাশালী পণ্ডিতেও যে বঙ্কিমচন্দ্রকে গুণবান্ বলিয়া স্বীকার করেন, এরূপ মনঃকষ্ট পাইয়া যদি ইহা বুঝিতে না হইত, তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হইত! 'বঙ্গদশন' পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া দিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

'বঙ্গদর্শন'

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমায় বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' আমিও প্রাণপণে মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায়

কলেজ রি-ইউনিয়ন

লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল কলিকাতায় 'কালেজ রি ইউনিয়ন' নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কালেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরে এক দিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগানবাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ-পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম এরূপ করিলে দশজনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতা স্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে, এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এইরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখনও একথা বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না। মানুষের মত মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল ফলিতে পারে, নহিলে পারে না। আমরা ত মানুষই নহি। তথাপি ঐ 'কালেজ রি-ইউনিয়নে' যাইতাম। যাইতাম, ওরূপ কিছু মনে করিয়া নয়, যাইতাম —কৃষ্ণবন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, প্যারিচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাব সৃষ্টির বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ

আমি দ্বিতীয় 'কালেজ রি-ইউনিয়নে'র সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতার 'মরকতকুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকারে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে! যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।

'বিষবৃক্ষ'

সে দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের মূর্ত্তিমান্ বাগাদি দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আপনি আপনার কোন্ উপন্যাসখানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন'? ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন—'বিষবৃক্ষ'। তখন, বোধ হয়, 'চন্দ্রশেখর' পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

হুগলীতে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল ৺কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইলসূত্রে হাইকোর্টে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত এবং উহার একটি বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। এক পক্ষের ইচ্ছা, বঙ্কিমবাবু দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিমবাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিমবাবুর পিতৃবন্ধু, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষাগ্রাম নিবাসী এবং ইদানীং কলিকাতার ঝামাপুকুর নিবাসী ৺রামকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আমার ভ্রাতা দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট

গমন করিলাম। তিনি তখন হুগলীর অন্যতম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কাছারী করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়াছিলাম, কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকীল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কোন্ মোকর্দ্দমায় আসিয়াছেন'? আমি বলিলাম, 'আমরা কোন মোকর্দ্দমায় আসি নাই, আমার নাম——'। 'চন্দ্রবাবু'!—এই বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাসমাদরপূর্ব্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটি অতি সুখকর অনুবোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রেব গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর।

বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ী—তাঁহার পিতা

সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃকবাড়ী জেলা ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন কালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা ঐ রেলপথের পূর্ব্বদিকে নৈহাটী ষ্টেশন হইতে ঐ ষ্টেশনের দক্ষিণদিক্স্থিত প্রথম ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সদর বাড়ীতে বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম এবং আমি বেলা ৯ ঘণ্টার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত সমবেত শ্রোতৃবর্গের মাথার উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্দ্ধহস্ত উত্তোলিত করিয় এক দীর্ঘকায় বিশালবপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন

উনিই বঙ্কিমবাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। আমার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্কিমবাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এই ভাবে ভোর—"আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্ব স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি একতালা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা—সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ গৃহটি বঙ্কিমবাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ জানি না। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরের পরম স্থান হইবে।

ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'আপনারা যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন!

অভ্যর্থনা

আমি মনে করিয়াছিলাম, আসিবেন না। রবিবার উকিলদের বাড়ীতে মক্কেলের ভিড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের ত আর কিছুই মনে থাকে না।' কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছিলাম। একবারের কথা বলি।

বঙ্কিমবাবু যে সময়ে কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া হুগলীতে কর্ম্ম

করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী লইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমাকে বলিয়াছিলেন—'যাইতেছ যাও, কিন্তু ওকাজে থাকিতে পারিবে না।' আমিও ছয় মাস মাত্র ডিপুটীগিরি করিয়া উহাতে ইস্তফা দিয়া আসি। তাহার দিন-কতক পরে বঙ্কিমবাবু হুগলীতে বাসা করেন। দুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। যোড়াঘাটের ঠিক্ দক্ষিণপার্শ্বের বাড়ীতে তাঁহার বৈঠক-খানা এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে দুইখানা বাড়ীর পর একটি বাড়ী তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর বাটীর পূর্ব্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত; উহার নীচে দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন বলিয়াছিলেন—'সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।' বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনার গুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনটি ঘর ছিল; তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজি-চেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবার সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটী দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র ঘাটের নিকট জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। একবার ঘাটে নৌকা পৌঁছিবামাত্র আমি নামিলাম না দেখিয়া বলিলেন,—'এস'। আমি বলিলাম—'যাব কি না তাই ভাব্‌ছি'। যাইবামাত্র হাসি আর আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব!

হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমবাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন তাহার কাছে কখনই খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক

দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়। শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়—আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। আমি ত অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়াছিলাম। আমার ঋষিতুল্য বন্ধু, রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, একবার মাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন—'বাঃ বঙ্কিমবাবু কি বন্ধু-বৎসল'! একবার সন্ধ্যার কিছু পরে পৌছিয়া শুনিলাম, তাঁহার জ্বর হইয়াছে—তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র উঠিয়া আসিলেন; আসিয়া নানা কথা কহিলেন। আমি যতক্ষণ আহার করিলাম ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলেন—যেন কোন অসুখ হয় নাই, যেন দেহে ও মনে স্ফুর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই!

বঙ্কিমবাবুর বন্ধু-সৎকার

বঙ্কিমবাবু সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন—আলাপ করিলেই ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে সংসর্গ না পাইলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই, সেবার গিয়া দেখি, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, কমনীয়তামিশ্রিত অসীম প্রতাপ ও পুরুষকারব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ! হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল; সেই কথা হইতে আরও কত কথা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কি

সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ

স্ফুর্ত্তি! স্ফূর্ত্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল—ইহাই ত সুখ, ইহাই ত জীবন,—এই রকমই ত চাই!

সাহিত্যের সংস্রবমাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। এক শনিবার আফিস হইতে বেলা তিনটা কি চারিটার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন, পাশে দুইখানা কেদারায় দুইটি যুবক বসিয়া আছেন। একটি যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানা ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমবাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটি চলিয়া গেলেন। তখন তাহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইহারা কতক্ষণ ছিলেন'? তিনি বলিলেন—'দুই তিন ঘণ্টা হইবে'। সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত ছোট বালক দুইটিকে লইয়া অতক্ষণ তেমন স্থির ধীর প্রফুল্লভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, বালকদ্বয় তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যের সংস্রব

মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককেই উৎসাহিত করিতেন। আমি কখনই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে মাতৃভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলেও উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না। কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম—কাহাকেও দেখাইতাম না। বঙ্কিমবাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়ীতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—'ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হইব'? তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শন

সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দান

প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন'। বঙ্কিম বাবুর যোড়াঘাটের বাড়ীতে আমি হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধু-স্বরূপ পাই হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটীতে। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরম ভক্ত দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

বন্ধু-সংঘ

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানা শাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীর-প্রকৃতি, বালকবৎ সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটি বন্ধু বড় অনুরাগভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার কলিকাতায় থাকিলে, তিনি ; তারাকুমার কবিরত্ন ; বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত ; কবি হেমচন্দ্র ; কোম্‌ৎ-মতাবলম্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র। আর সেখানে থাকিতেন—বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম দাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম।

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

——:০*০:——

মানুষের দুইটা জীবন আছে—একটা দেহরাজ্যে, আর একটা মনন-রাজ্যে। দেহ-রাজ্যের জীবনটা সামান্য, সঙ্কীর্ণ-ক্ষেত্রে আবদ্ধ এবং শক্তি, সময় ও সুবিধা দ্বারা নিয়মিত; কিন্তু মনন-রাজ্যের জীবনটা অতি বৃহৎ সুদূর প্রসারিত ও গগন-সঞ্চারী বায়ু স্রোতের ন্যায় স্বাধীন। জগতের মহামনা ব্যক্তিগণ দেহ-রাজ্যের জীবনকে তুচ্ছ জানিয়া মনন-রাজ্যের জীবনকেই সার জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যাঁহারা মানবসমাজের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের মনন-রাজ্যেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে কতকগুলি উপাদান দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে প্রধান—বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা এবং মনন-গঠিত আদর্শে অনুরাগ।

মানব জীবন—দেহ-রাজ্যে ও মনন-রাজ্যে

যাঁহারা মনন-গঠিত আদর্শ লইয়া জীবিত থাকেন, তাঁহারাই সার্থক-জীবিত। তাঁহাদের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। তাঁহাদিগকে লইয়াই জাতির গৌরব। যেমন দূর হইতে হিমালয়ের পাদশৈল সকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চির তুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং হিমালয়ের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনই অপর জাতি সকল দূর হইতে এই সকল অসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত

মহতের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি ও গৌরবের ধন

মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত মহত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকে। ইঁহাদিগকে বুঝিতে পারা এবং সমুচিত শ্রদ্ধা দিতে পারাও মহত্ত্বে উঠিবার সোপান স্বরূপ। ইঁহাদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং ইঁহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। ইঁহারা যখন অন্তর্হিত হন, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে ইঁহাদের চরিত্র-সম্পত্তি পাইয়া আমরা ধনী হই। ইঁহাদের চরিত্রের গুণাবলী অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মার অস্থিমজ্জাতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যায়। বিধাতার এই সত্যময়রাজ্যে এক কণাও খাঁটী জিনিষ নষ্ট হয় না।

ভিতরের মানুষ — মনন-রাজ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভিতরের মানুষটা কি ছিল, তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। সেটা কি—যদ্দ্বারা বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব হইয়াছিল, যাহা তাঁহাকে পার্থিব ধনমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতে দেয় নাই, যাহা তাঁহাকে সোজা পথে নিজ অভীষ্টদিকে লইয়া গিয়াছিল?

সোজা পথ

এ জগতে সোজা পথে চলাটা কি বড় সহজ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি সোজা পথে চলা যায়? যদি গগনে ধ্রুবতারা না থাকিত, তাহা হইলে নাবিকগণ কি সোজা পথে চলিতে পারিত? সেইরূপ এই তেজস্বী পুরুষসিংহগণ যে জীবনে সোজা পথে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি? আমি যখন আট বৎসরের বালক, তখন প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং সেই দিন হইতেই আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। আমি এই জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে চলিতে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার মধ্যে একজন প্রধান।

এখন জিজ্ঞাস্য,—বিদ্যাসাগর চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কি জিনিষ, যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজা পথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানবজীবনের মহত্ত্ব-জ্ঞান। কথাটা শুনিতে ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড়। তুমি আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্ স্থান অধিকার করিব, তাহার অনেকটা ইহার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি জীবনটাকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখ, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাতেই সন্তুষ্ট হইবে; যদি মহৎ করিয়া দেখ, তবে মহত্ত্বের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে। তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চবোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্মসকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষসিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে সমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া উর্দ্ধশিরাঃ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মেরুদণ্ড—মহত্ত্বজ্ঞান ইহার প্রভাব—

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখকাতর হৃদয় ছিল, সেই জন্যই অপরের প্রতি অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে কোনও মনুষ্যত্বের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে, তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানব-জীবনের পক্ষে এত হীনতা মনে করিতেন যে, তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত।

পরদুঃখকাতরতা, অসত্য ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা

পূর্ব্বে যে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি,—যাহা মানব প্রকৃতির গভীর রহস্য এবং যাহা মানবজাতির মুখপাত্রস্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে,—উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন, ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন, তাহার সহিত তুলনাতে বর্ত্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত যে, বর্ত্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ, যখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় খাটিবার শক্তি ছিল না, তখন এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশায়ী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল। প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঐ অনল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বালারাশি প্রকাশ করিত। তাঁহার কোমল ও পরদুঃখকাতর হৃদয়ে বর্ত্তমান সময়ের অসারতা, কৃত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় তাঁহাকে যাতনায় অস্থির করিয়া তুলিত।

বর্ত্তমানে অতৃপ্তি
ভবিষ্যৎ রচনা ও
আদর্শে আসক্তি

বর্ত্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎ রচনার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজ অন্তরে ভাবি-ভারতের কি ছবি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দেশমধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি চেষ্টা দ্বারা তিনি জানিতে দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের একটি ছবি তাঁহার হৃদয়ে ছিল। তিনি সেই ছবির দিকে স্বদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং শীঘ্র যাইতেছে না বলিয়া সহিষ্ণুতা হারাইতেছিলেন। সে ছবিটির সমগ্র আয়তন ও পরিসর নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই; কিন্তু স্থূলতঃ তাহার মূল ভাবটি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক যুগ-প্রবর্ত্তক ব্যক্তির ন্যায়, তিনি পূর্ব্ব

ভবিষ্যৎ রচনা

ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে; আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্য জ্ঞানে অভিজ্ঞপুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসী দেশ-প্রসিদ্ধ কোমৎ দর্শন বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলে, মিত্র মহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে বলিলেন,—"বাবাঃ একটা রাক্ষস; দেখ্‌লে, যেমন বিদ্যার দৌড়, মানুষটার যেমন হৃদয় তেমনি মাথা! এ কথা অবাধে বলা যায় যে, তিনি প্রতীচ্য জগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্য-জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন, প্রাচ্য প্রীতি ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাহিত্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভুত সমাবেশ করিয়া নব-সাহিত্যের আবির্ভাব করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনই মানব-চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।

আদর্শের মূলতত্ত্ব—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়

আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি; প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে শুনিতেছি—আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্যজ্ঞানের আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহা স্বদেশবাসী ও স্বদেশবাসিনীদিগকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টকে প্রবাচনা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল বা আদর্শস্কুল

শিক্ষা বিস্তার

স্থাপন করিতে লাগিলেন। কি অসুবিধাতেই তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল—না ছিল উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক। নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অনেকস্থলে টোলের পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা-বিস্তার করিতে হইয়াছে।

তিনি যে কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই এই প্রতীচ্য জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বর্ত্তমান বেথুন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও উক্ত কলেজে গিয়া বালিকাদিগকে বিধিমতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দেশের নানাস্থানে বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে ডিরেক্টারের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়, সেই মতভেদ হইতে মনোমালিন্য জন্মে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্য জীবনে প্রতীচ্যজ্ঞানের সমাবেশ না হইলে দেশ উন্নত হইবে না। অতএব বলিতেছি, তিনি বর্ত্তমানে অতৃপ্ত হইয়া নিজ মনে মনে একটা ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া তদভিমুখে স্বদেশকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন

এ জগতে দুইশ্রেণী লোকের দুই প্রকার ভাব দেখি। এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতিতে শ্রদ্ধার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক; তাঁহারা অতীতের প্রতি এমনটা শ্রদ্ধাসমন্বিত যে বর্ত্তমানের প্রতি যখনই তাঁহাদের অতৃপ্তি জন্মে, তখনই তাঁহারা আবেগের সহিত অতীতের দিকে যাইতে চান—তাঁহাদের চিত্ত অতীতের দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়ায়, অতীতের চিন্তার মধ্যেই তাঁহারা বাস করিতে ভালবাসেন। অপর শ্রেণী সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দিকে মুখ

অতীতদর্শী ও ভবিষ্যৎদর্শী

ফিরিয়া রহিয়াছেন। ভবিষ্যতের মধ্যেই তাঁহারা বাস করেন। আশার চক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখেন ও সেইদিকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে লইতে চান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শাক্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, এই প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরই মানবমনের উপর সমধিক প্রভাব হইয়া থাকে। কারণ, আশার অপেক্ষা ভাল জিনিষ আর নাই; যে মানুষকে আশা দেয়, সেই জীবন দেয়। যিনি বলেন—'তোমরা এখন মলিন বটে, কিন্তু চিরদিন মলিন থাকিবে না, তোমাদের জন্য শুভদিন আসিবে—চল, তদভিমুখে অগ্রসর হই',—তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু, আমরা এরূপ সেনাপতির বিজয়-বৈজয়ন্তীতলে দাঁড়াইতে ভালবাসি।

আশ্বাসবাণী

আমরা নির্জ্জনে জীবনের ভার বহনে ম্লান ও মিয়মান হই, তখন যদি কোন ধনবান্ পুরুষের আশাজনক বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে,—যদি শুনিতে পাই, একজন বলিতেছেন—'অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, ভয় নাই জয়-শ্রী সম্মুখে'—তাহা হইলে আমাদের অবসন্ন মনে তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, আমরা স্বতঃই তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হই। এইরূপ বিক্রমশালী ও আশাপূর্ণ ব্যক্তিরাই মানবসমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরম লাভ—একবার দেখিলে তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে।

আমরা বাল্যকালে লোকের মুখে শুনিতাম, চোরেরা তৈলাক্ত হইয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে,—যদি ধরা পড়ে যেন পিছলাইয়া পলাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, এক শ্রেণীর পবিত্রচেতা মানুষ যেন তৈলাক্ত হইয়া

নির্লিপ্ততা

এ সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহারা এখানকার পথে গতায়াত করেন, অথচ এখানকার কর্দ্দমপঙ্ক তাঁহাদিগের আত্মাতে লাগে না এবং এখান-

কার পাপপ্রলোভনে ধরিলেও তাঁহারা পিছলাইয়া যান। যাহা সৎ—তাহার আচরণ করাই ইঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; যাহা অসৎ—তাহা ইঁহারা দেখিয়াও দেখিতে পান না। সকল সাধুভাব, সকল মঙ্গলভাব যেন স্বাভাবিকরূপেই ইঁহাদের অন্তরে আশ্রয় পায়, অসাধুভাব সকল যেন হৃদয়ে প্রবেশের দ্বার পায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতার সহিত বাস করেন, আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইদিনে যখন—তিনি সংসার হইতে অপসৃত হইলেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি জীবনের কত পথেই ভ্রমণ করিয়াছেন, কত প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কত পাপের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াছেন,—কিন্তু কিরূপে শিশুর ন্যায় সরল, অকপট হৃদয়টি লইয়া চলিয়া আসিলেন! তিনি কিরূপে এই সহরে নানা অবস্থার মধ্যে বাস করিলেন, অথচ পাপপঙ্ক তাঁহার আত্মাতে লাগিল না—এরূপ ধর্ম্মে অনুরাগ কিরূপে রাখিলেন, যাঁহাতে তাঁহার চিত্তটি চিরদিন সরল ও সত্যানুরাগী রহিল? জীবনের মহৎ লক্ষ্যের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশ ইহার কারণ। তুমি যদি চরিত্রের মহত্ত্ব সাধনাকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে কর, এবং জীবিকার উপায়সকলকে উপলক্ষ্য মনে কর, তাহা হইলে সেই উপলক্ষ্য-গুলি আর তোমাকে বাঁধিতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশহিতকর সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বতোমুখী স্বদেশপ্রিয়তা প্রায় দেখা যায় না। এক সময়ে ধর্ম্মসংস্কারবিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সহিত সংযুক্ত ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' লেখকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। ক্রমে, নানা কারণে

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা

সে সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে চিরদিন জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে বিভাগে যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হইত, তখনই সেবিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন।

সাহিত্য-সেবা

তাঁহার প্রণীত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রথমে সুমিষ্ট সুললিত বাঙ্গালা রচনার প্রণালী প্রদর্শন করিল। তৎপরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষা সে দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই পুরাতন সংস্কৃতের ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে নূতন পথপ্রদর্শকের মহিমা কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? তাঁহার 'সীতার বনবাসের' কথা কি আমরা কখনও ভুলিতে পারিব? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষা কি পরিমাণে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঋণী, তাহা কি নির্দ্দেশ করা যায়?

বিদ্যালয় ও কলেজ সংস্থাপন, স্বদেশানুরাগ

একদিকে তিনি যেমন বিশুদ্ধ, কোমল, হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে বিদ্যালয়সকল স্থাপন করিয়া শিক্ষা-বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দেখিলেন, উচ্চ শিক্ষাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকদিগের জীবিকা অর্জ্জনের ও মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায়; তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকদিগের সামান্য ব্যয়ে উচ্চশিক্ষার্থ নিজব্যয়ে নিজ বাসগ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল ও কলিকাতায় মেট্রপলিটন কলেজ স্থাপন করিলেন। এজন্য তাঁহাকে কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একদিকে তিনি যেমন শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইলেন, অপরদিকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিবিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ফলকথা, তিনি যে কার্য্যে দেখিতেন, দেশের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা

তাহাতেই সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। তাহার অর্থ ও সামর্থ্য সে কার্য্যে নিয়োজিত হইত।

তাঁহার স্বদেশানুরাগ যেমন সর্ব্বতোমুখ ছিল, তাঁহার বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য সমুদায় সেইরূপ সর্ব্বতোমুখ ছিল। তাঁহার প্রীতি, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি ধাবিত হইত। কোন কোন ইংরাজের সহিত তাঁহার এত-দূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরব জ্ঞান প্রকাশ পাইত যে, তাঁহারা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাঁহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থেই জন্যই তাঁহাদের সাহায্য চান, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

সামাজিক ব্যবহার—বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য প্রভৃতি

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে গুণের জন্য দেশের লোকের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহার উল্লেখ এখনও করা হয় নাই—তাহা তাঁহার ভুবন-বিখ্যাত দয়া। এ বিষয়ের অসংখ্য গল্প দেশে প্রচলিত আছে—সে সকলের উল্লেখ করিতে গেলে, প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে এবং তাহা আমার সাধ্যও নহে। তবে তাঁহার দয়া যে কিরূপ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিত, তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। একবার মান্দ্রাজ প্রদেশের দুইটি ভদ্রঘরের ছেলে কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া অর্থাভাবে নিরুপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। কলিকাতার দলপতি বাবুদিগকে ধরিলে চৌদ্দ পনর টাকা স্থলে, দুই এক টাকা করিয়া মাত্র আট দশ টাকা স্বাক্ষরিত হইল—যাহা স্বাক্ষরিত হইল, তাহাও আদায় হয় না—

বিদ্যাসাগরের দয়া

দুই চারিবার করিয়া যাইতে যাইতে তাহাদের সমুদয় সময় নষ্ট হইতে লাগিল—পড়াশুনা একবারে বন্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থাতে তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি তখন মাতৃশোকে কাতর হইয়া চিৎপুরের এক নির্জ্জন উদ্যানে একাকী বাস করিতেছিলেন। সেখানে তাহারা উপস্থিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া ও তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাহারা ভদ্রঘরের সন্তান। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, দশটি টাকা স্বাক্ষর করাইয়া তাহারা প্রায় এক মাস কাল দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া তাহাদের চাঁদার বইখানি দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—'তোমরা গিয়া পড়াশুনা কর, প্রতি মাসের ২রা কি ৩রা তোমাদের জন্য ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তোমাদের বাসাতে যাইবে।' তাহারা যতদিন এখানে ছিল, ততদিন মাসিক ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তাহাদের জন্য আসিত। সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার হৃদয় কি প্রশস্ত ও উদার ছিল!

সর্ব্বশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি প্রধান গুণের কথা উল্লেখ করিতেছি—সেটি তাঁহার অকৃত্রিমতা। হায়! হায়! এমন স্পৃহণীয় অকৃত্রিমতা আর কোথাও দেখিব না—প্রকৃতির হাতে গড়া এমন আভাঙ্গা মানুষটি প্রায় পাওয়া যায় না।

অকৃত্রিমতা

তোমরা দশজনে তাঁহাকে কি দেখিবে ও কি বলিবে তাহা তাঁহার মনেই হইত না। তিনি গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্নসম্ভূত প্রকাণ্ড ওকবৃক্ষের ন্যায় শৈবালরাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সে তরু বাবুদের বাগানে থাকিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু তাঁহার সেই স্বভাবজাত বন্ধুরতার মধ্যেও একপ্রকার গাম্ভীর্য্যসম্বলিত মনোহারিত্ব ছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভালবাসিতাম যে, তাঁহাতে তাজা খাঁটি ষোল আনা

মানুষটি পাইতাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন—এমন প্রেমিক বন্ধু বঙ্গদেশে কেহ কখন দেখিয়াছেন কি না জানি না। বন্ধুগণকে ভালবাসিয়া, উপহার দিয়া, খাওয়াইয়া কখনই তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তাঁহার বন্ধুগণ পরলোকগত হইলেও, তাঁহার প্রেম তাঁহাদের পরিবার পরিজনকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিত। এমন মাতৃভক্ত কে কবে দেখিয়াছেন? তাঁহার আরাধ্যা জননীদেবীর স্বর্গারোহণ হইলে, নিকটের লোক প্রায় দুই তিন বৎসরকাল সতর্ক থাকিতেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার জননীর উল্লেখ করিতেন না, কারণ, তাহা হইলে, তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতেন।

বন্ধুতা

মাতৃভক্তি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেম যেমন সতেজ ছিল—তাঁহার বিদ্বেষও তেমনই তেজস্বী ছিল। যাহার স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া একবার চটিতেন, তাহার নাম আর শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ছিল যে, বিপদে পড়িলে সেই সকল ব্যক্তিরও সাহায্য করিতে ক্রটী করিতেন না।

বিদ্বেষ-ভাব

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজ-কর্ম্ম, আলাপ-পরিচয়, আমোদ-প্রমোদ সকলের মধ্যে এমন এক অকৃত্রিমতা দেখিতাম, যাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইত। আমরা মানুষ, আমরা আসল মানুষটা ধরিতে পারিলে বড় সুখী হই। এই জন্য বড়লোকদিগের জীবন চরিত পাঠ করিবার সময়ে, তাঁহারা দশের মাঝে কি কাজ করিয়াছিলেন, প্রকাশ্য সভায় কি বলিয়াছিলেন, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তত ব্যগ্র হই না; কিন্তু গৃহে, পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কি করিয়াছিলেন বা বলিয়াছিলেন,

আসল মানুষ

তাহা শুনিতে ভালবাসি, কারণ সেখানে আসল মানুষটা ধরিতে পারা যায়। আমাদের এই আসল মানুষ দেখিবার কামনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয়।

উপসংহার

পরিশেষে যে উক্তি স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই পুনঃ স্মরণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ঋষিরা ঠিক বলিয়াছেন, যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে, সেই প্রকৃতভাবে জীবিত। জীবনের ধন ধান্য লইয়া জীবন নহে কে কত উপার্জ্জন করে, কে কত সঞ্চয় করে, তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতি নহে। কিন্তু কে কি চিন্তা করে, কে কি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, কে কি আদর্শ লইয়া চলে, তাহা লইয়াই জীবনের বিস্তার। চরিত্র বস্তুটা যাঁহাদের সাধনার বিষয়, তাঁহারা মনন-রাজ্যেই বাস করেন এবং দেহ-রাজ্যটাকে সামান্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হস্তে যেমন হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন—তেমনই আর এক হস্তে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত মত ধনাগমের একটা উপায় করিতেন; কিন্তু আপনার চরিত্রটাকে সর্ব্বপ্রযত্নে বাঁচাইতেন। এইরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ যে দেশে উদিত হন, সে দেশ ধরায় মহত্ত্ব ও গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গের আদি গৌরব দীপঙ্কর

(শরচ্চন্দ্র দাস)

দীপঙ্কর

বৌদ্ধ-জগতে দীপঙ্কর বিশেষ প্রসিদ্ধ। বঙ্গের সৌভাগ্যবশতঃই তিনি বাঙ্গালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অল্প লোকেই জানে। যে মহাপুরুষ তিব্বতের আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষাগুরু, যাঁহার নাম শুনিবামাত্র প্রধান লামা ও চীনের সম্রাট্ আজিও সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন, তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সার্দ্ধ আটশত বৎসর পরে একথা স্মরণ করিলেও ক্ষীণপ্রাণ

বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হৃদয় এক অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে; তখনই বর্ত্তমান বঙ্গভূমি ছাড়িয়া মন সহসা অতীত বঙ্গের সেই অমরাবতীতে উপস্থিত হয় এবং অধঃপতিত দেশের দুরবস্থা ভুলিয়া ভূত-সৌভাগ্যের সেই দেবোদ্যানে বিচরণ করিতে থাকে॥

৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগরে তত্রত্য রাজকুলে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে চন্দ্রগর্ভ বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবেই দীপঙ্কর বাল্যশিক্ষার নিমিত্ত জিতারি নামক জনৈক অবধূতের নিকট প্রেরিত হন। তথায় বর্ণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি পঞ্চবিজ্ঞানে মনোনিবেশ করিলেন। সেই দিন তাঁহার দর্শন ও ধর্ম্মনীতি-শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইল। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মের বীজ অল্পদিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইল। যে সময়ে শঙ্করাচার্য্যের চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধিক্ষেত্রে হিন্দুর বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত হয়, সেই সন্ধিকালে মহামতি দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের মুমূর্ষু কলেবরে যেন সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জন্ম—শৈশব, শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব

দীপঙ্করের বাল্যজীবনে তাঁহার ভবিষ্য গৌরবের নিদর্শন দেখা গিয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত মেধা ও গভীর অভিনিবেশ দর্শনে জিতারি বিস্মিত হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত দীপঙ্করের প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল; অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে তিনি পারদর্শিতা লাভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দীপঙ্করের যশোবিভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে গর্ব্বান্ধ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে

হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শনে পারদর্শিতা—উপাধি লাভ

আপনাদের স্বনাম বিসর্জ্জন দিয়া অবনত-মস্তকে দেশে প্রতিগত হইলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্বও স্বীকার করিলেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর ওদন্তপুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীল রক্ষিতের নিকট 'শ্রীজ্ঞান' নাম পাইয়াছিলেন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষু আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মরক্ষিত তাঁহার দীক্ষাগুরু। অতঃপর দীপঙ্কর মগধের প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী বৌদ্ধ আচার্য্যদিগের নিকট সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মতৃষ্ণা

এইরূপে দীপঙ্করের জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না; বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও তিনি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তৎকালে সুবর্ণ দ্বীপ (ব্রহ্মদেশ) প্রাচ্য জগতে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি তথাকার প্রধানতম যাজক। দীপঙ্কর অবশেষে তাঁহারই নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন এবং কতিপয় বণিকের সমভিব্যাহারে বৃহৎ নৌকারোহণে সুবর্ণদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষণ সমুদ্রবক্ষে প্রকাণ্ড তরণী, প্রচণ্ড ঝটিকা ও তুফানের ক্রীড়া-পুত্তলিস্বরূপ ভাসিয়া চলিল; পথিমধ্যে কত কষ্ট, কত বিঘ্ন, পদে পদে তাঁহার মঙ্গলযাত্রায় নানা অমঙ্গলের সূচনা করিল। অবশেষে তের মাস পরে নৌকা সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে উপনীত হইল। তথায় দ্বাদশবর্ষ অবস্থিতিপূর্ব্বক তিনি অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া কতকগুলি বণিকের সহিত একখানি বৃহৎ পোতারোহণে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তিনি তাম্রদ্বীপ ও অরণ্যদ্বীপ

ব্রহ্মদেশ যাত্রা ও প্রত্যাগমন

দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মগধে প্রতিগমন করিয়া শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধূত, তন্ত্রী প্রভৃতি যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মগধের বৌদ্ধেরা দীপঙ্করের অতুল পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তথাকার ধর্ম্মপালরূপে মনোনীত করিলেন। বলা বাহুল্য, এ সম্মান বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠ। সেই দিন মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। দীপঙ্করের যশোবিভা দাবানলতেজে ভারতের চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজা ন্যায়পাল তদীয় অনুপম গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী বিক্রমশীলের প্রধান যাজক পদে স্থাপিত করিতে চাহিলেন। সদাশয় দীপঙ্কর তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এই সময়ে কাম্যদেশের (কণোজের) রাজা মগধ আক্রমণ করেন। ন্যায়পালের সেনাদল বার বার যুদ্ধে পরাস্ত হইল এবং শত্রুসেনা রাজধানীর নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল উপায়ান্তর না দেখিয়া ন্যায়পাল কাম্যরাজের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। দীপঙ্করের বিশেষ চেষ্টায় সেই সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন উভয় রাজাই বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

দীপঙ্কর 'ধর্ম্মপাল'—তাঁহার যশোবিভা ও কবিত্ব

এই সময়ে হিমালয়ের উত্তরপ্রান্তে সুদূর তিব্বতে দীপঙ্করের অমরত্ব লাভের পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হইতেছিল। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াও তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদা তিব্বতের অধিপতি লালামাও তাঁহাকে "অতীশ" (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। থোলিং নগরে লালামার প্রধান রাজপীঠ ছিল। তদীয় রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধনীতির সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রধান

তিব্বতের লামার দূত প্রেরণ

প্রধান বৌদ্ধবিহারে কতিপয় নবীন সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা কাশ্মীর প্রভৃতি নানা স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইলেন। তথায় দীপঙ্করের যশোগৌরব তাহাদের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ-সকাশে তাঁহার সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এরূপ অদ্বিতীয় বৌদ্ধ আচার্য্যকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন এবং প্রভূত সুবর্ণ ও একশত পরিচারকের সহিত একজন বিশ্বস্ত রাজপুরুষকে মগধে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে অসীম কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া রাজদূত বিক্রমশীলায় উপনীত হইল এবং দীপঙ্করের সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন করিয়া রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। দীপঙ্কর তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শত অনুনয় বিনয়, সহস্র প্রলোভনে সেই তেজস্বী মহা-পুরুষকে ভুলাইতে পারিল না। তিনি কিছুতেই তিব্বতে যাইতে চাহিলেন না। রাজদূত কাঁদিতে কাঁদিতে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

এই সময়ে হ্লালামা হিমাদ্রি পার হইয়া "গেলেন" (গড়োয়াল ?) রাজ্যের সীমান্তদেশে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে আসিয়া তত্রত্য রাজা কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পুনঃ প্রেরণ

রাজদূতের মুখে দীপঙ্করের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া হ্লাম্ব পুত্রদিগকে মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—"যে প্রকারে হউক দীপঙ্করকে আনিয়া তিব্বতের ধর্ম্মসংস্কার করিতে হবে।" তদনুসারে তাঁহারা দীপঙ্করের নিকট পুনর্ব্বার লোক পাঠাইলেন।

তিব্বতেশ্বরের বার বার বিনীত ব্যগ্রতা দেখিয়া উদারহৃদয় দীপঙ্করের

মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট বৎসর হইলেও সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি সেই সুদূরদেশে গমন করিলেন। সঙ্গে তদীয় ভ্রাতা বীর্য্যচন্দ্র এবং রাজ ভূমিগঙ্গ ও সেই তিব্বতীয় রাজদূত প্রভৃতি রহিলেন। অনন্তর ১০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা তিব্বতে উপনীত হইলেন। রাজা দীপঙ্করকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। অচিরকালমধ্যে এই মহাত্মার মহাশিক্ষার গুণে তিব্বতের দূষিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার হইল। তিব্বতের অধীশ্বর ইঁহাকে "অতীশ" বলিয়া স্বীকার করিলেন। ত্রয়োদশবর্ষ বিপুল যশঃ ও গৌরব অর্জ্জনপূর্ব্বক বৌদ্ধজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে

তিব্বত যাত্রা

মহাত্মা দীপঙ্কর লাসা নগরীর নিকটবর্ত্তী ঙেয়ঙ্গ নগরে দেহত্যাগ করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্ত কাল-সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তিব্বতের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক জগতে কত বিপ্লব ঘটিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীর আদি গৌরব দীপঙ্করের নাম ও গৌরব তথায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেই জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী বলিয়া একদা এ বিনীত পরিব্রাজককে সেই সুদূর প্রবাসে তত্রত্য প্রধান পুরুষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেহত্যাগ

মহাভিনিষ্ক্রমণ।

(কৃঃবিহারী সেন)

মহাভিনিষ্ক্রমণ

নগরের বাহিরে আসিয়া সিদ্ধার্থের কপিলবস্তুর প্রতি একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখনই যেন কে তাঁহাকে বলিল—"যখন মায়া কাটাইয়াছ, তখন আর মায়ার দ্রব্য দেখিয়া কি হইবে?" তিনি আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অগ্রসর হইলেন।

'মার' কর্তৃক প্রলোভন—সিদ্ধার্থের অনুগমন

বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে যে, যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থ রাজভবন-দ্বার অতিক্রম করিয়া আসিলেন, সেই মুহূর্ত্তে 'মার' বলিয়া পাপপুরুষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে সিদ্ধার্থকে বলিল—"তুমি পিতা, পুত্র, স্ত্রী ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? এমন কর্ম্ম কখন করিও না। সন্ন্যাসী হইয়া কি হইবে? আমি সপ্তাহমধ্যে তোমাকে চারি দ্বীপের চক্রবর্ত্তী রাজা করিয়া

দিব। শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।” সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কে?” সে উত্তর দিল—“আমার নাম ‘মার’।” সিদ্ধা বলিলেন—‘আমি মনে করিলে রাজা হইতে পারি, তাহা জানি। কি আমি তাহা হইব না। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে? সম মায়াবন্ধন কাটিয়া আমি বুদ্ধ হইব, ইহাই আমার মানস।” পাপ-পুরু পরাস্ত হইল। কিন্তু সে মনে মনে বলিল—‘‘আচ্ছা,—তুমি আমাবে ছাড়িলে, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িতেছি না। কাম, ঈর্ষ্যা এব মোহ এই তিন অস্ত্র আমার হাতে। ইহাদিগের সাহায্যে আম তোমাকে পরাস্ত করিব।” সেই পর্য্যন্ত যেমন ছায়া শরীরের অনুগমন করে, ‘মার’ সিদ্ধার্থের অনুগামী হইল, আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না।

এই আখ্যায়িকাটি একটি সুন্দর রূপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সিদ্ধার্থের জীবনে ‘মার’ বলিয়া পাপপুরুষের নাম আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাইব। সংস্কৃত অভিধানে ইহার অর্থ কাম। কিন্তু বৌদ্ধেরা ইহাতে একটি বিশেষ পুরুষত্ব আরোপ করে। কাম অথবা পাপ বলিয়া একজন বিশেষ পুরুষ আছে। লোকদিগের মনে পাপরাজ্য বিস্তার করাই তাহার কার্য্য। যখনই কেহ কোন সাধু উদ্দেশ্য পালন করিবে বলিয়া কৃতসংকল্প হয়, তখনই ‘মার’ আসিয়া তাহাকে সুখ-ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া কুপথে আনিবার চেষ্টা করে। পাপ বলিয়া একটি বিকার আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করে। ইহা মানুষের রক্তমাংসে সংযোজিত। যেখানে মানুষ সেই খানে পাপ। যখন মানুষ সবল, প্রকৃতিস্থ না থাকে, তখন এই বিকার আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আমরা ইচ্ছা করিলেও, প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও ইহাকে তাড়াইতে পারি না। যথেষ্ট সাধু ইচ্ছার সঙ্গে, ঘোর নিষ্ঠা ও তপস্যার মধ্যে, যখন জানিতেছি যে,—স্বর্গ আমার চক্ষের সম্মুখে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই সেইখানে প্রবেশ করিতে পারি,—ঠিক তখনই পাপ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই যে পাপের এক বিশেষ ক্ষমতা, এই যে পাপের সদাব্যস্ততা, ইহা দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পাপকে কোন বিকার না বলিয়া পুরুষভাবে

বৌদ্ধধর্ম্মে ‘মার’

কল্পনা করিয়া লইয়াছে। 'মার' মনুষ্যকে সৎ হইতে অসৎ পথে লইয়া যাইবার জন্য সদা ব্যগ্র।

পাপ কখন মনুষ্যকে ছাড়ে না। মনে সাধু চিন্তা আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপচিন্তা আসে। বিশেষতঃ যখন কোন লোক সংসার

পাপের প্রলোভন ও কার্য্য

পরিত্যাগ করিয়া যাইব বলিয়া কৃতসংকল্প হয়, ঠিক সেই সময়ে তাহার মনে সংসারে ফিরিয়া যাইবার প্রলোভনও আসে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বেই কে যেন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধরিতে আসে। কেবল বলে—"কেন ঝাঁপ দিতেছিস্? কেন চিরদিনের জন্য ডুবিয়া মরিবি? ফিরিয়া আয়, সুখে থাক্, কোন বিপদে তোকে আক্রমণ করিবে না।"

সিদ্ধার্থের মনে এই প্রকার ভাব আসিয়াছিল। মহাপুরুষেরা যে কার্য্যে হাত দেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সিদ্ধার্থ যদি

সিদ্ধার্থের ভাব

সন্ন্যাসী না হইয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ দিতেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিবলে, বাহুবলে রাজাধিরাজ হইতে পারিতেন। তাঁহার এ ক্ষমতা ছিল, ইহা তিনি জানিতেন। সেইজন্য যখন তিনি একটিকে অবজ্ঞা করিয়া অন্য আর একটিকে গ্রহণ করিবেন, তখনই তাঁহার মনে পাপচিন্তা আসিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! 'মার' তাঁহাকে বলিল—"আমি তোকে সাত দিনের ভিতর পৃথিবীর রাজা করিয়া দিব। তুই সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিস্ না। ইহাতে ক্লেশ ভিন্ন সুখ নাই। তুই মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিবারও উপায় থাকিবে না। আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাকে পরাক্রান্ত রাজা করিয়া দিব, পৃথিবীর অনন্ত-ভাণ্ডার তোমার হইবে"। সিদ্ধার্থ যে অসীমসাহসিক ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্যতীত আর কাহারও মনে এইরূপ পাপচিন্তা আসিলেই পরাস্ত হইত। কিন্তু সিদ্ধার্থ বলিলেন—" 'মার', দূর হইয়া যা। আমি তোর হইব না। আমি অনন্তরাজ্যের অধিকারী হইব।" সিদ্ধার্থ মনুষ্য ছিলেন, এবং একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। মনুষ্য বলিয়া তিনি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু অসাধারণ মনুষ্য বলিয়া তিনি তাহাকে অক্লেশে পরাজয় করিলেন।

সেই রাত্রে সিদ্ধার্থ ছয় যোজন, অর্থাৎ ২৪ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিলেন। তিনটি রাজ্য অতিক্রম করিয়া তিনি এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

এক রাত্রিতে ছয় যোজন পথ অতিক্রম

তৎপরে দেখেন যে, সম্মুখে অনুবৈনেয় প্রদেশ এবং তাহার রাজধানী মৈনেয় নগর। এই নগর অলোমা নদীর তীরে। অলোমাকে এখন কুদবানালা বলে। ইহা অন্যান্য স্রোতের সহিত মিলিয়া অবশেষে মগরা নদীতে পতিত হইয়াছে।

এই স্থানে আসিতে আসিতে সূর্য্যোদয় হইল। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক, এ নদীর নাম কি?" ছন্দক বলিল—"অলোমা।"

'অলোমা'তীর

তখন তিনি বলিলেন—"যে মহৎ উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা করিয়াছি, সেই উদ্দেশ্যের আমি উপযুক্ত হইব।" এই বলিয়া তিনি অশ্বকে চালনা করাতে কণ্টক এক লম্ফে অলোমার অপরতীরে উপস্থিত হইল। যে স্থানে তিনি অলোমা নদী পার হইয়াছিলেন, সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই স্তূপ আর নাই, তবে অসংখ্য ইষ্টকরাশি এই স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

অলোমা পার হইয়া তিনি প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তথায় এক হ্রদ ছিল। সেই হ্রদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিতিকালে

ত্যাগ ও সন্ন্যাস

তিনি ভাবিলেন—আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, কিন্তু এখনও আমার মস্তকে দীর্ঘ কেশরাশি ও শ্মশ্রু আছে। এগুলি থাকা উচিত নহে। তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তদ্দ্বারা কেশগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। এই স্থলে ভক্ত বৌদ্ধেরা একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহাকে "চূড়াপ্রতিগ্রহণ স্তূপ" বলিয়া ডাকিত। তথা হইতে কিয়দ্দূর উত্তরে গিয়া তিনি দেখিলেন, সেখানে কতকগুলি জম্বুবৃক্ষ রহিয়াছে। বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তাঁহার মনে হইল যে, তিনি এখনও প্রকৃত সন্ন্যাসী হন নাই। তিনি এখনও বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত আছেন। ইতোমধ্যে সেই স্থান দিয়া এক ব্যাধ গমন করিতেছিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভাই, আমার এই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে তোমার ঐ কাষায় বস্ত্র আমাকে দিবে কি?" লুব্ধক

লিল —"কেন? আপনি আপনার বেশে শোভা পাইতেছেন, আমার বেশ আমাতেই শোভা পায়।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"আমি তোমার নিকট তোমার বস্ত্রগুলি ভিক্ষা চাহিতেছি। আমার অনুরোধ রক্ষা কর।" ব্যাধ নিজ বস্ত্র তাঁহাকে দিয়া তাঁহার বস্ত্র গ্রহণ করিল। যে স্থানে এই ঘটনাটি হইয়াছিল, সেই স্থানে এক চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহাকে "কাষায়গ্রহণ চৈত্য" বলিয়া ডাকিত। তৎপরে তাঁহার গাত্রে যত অলঙ্কার ছিল সকলই খুলিয়া তিনি ছন্দকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"ছন্দক, তুমি এই অলঙ্কারগুলি লইয়া কণ্টকসহ নগরে প্রত্যাগমন কর। আমি আর ফিরিতেছি না।" ছন্দক সিদ্ধার্থের নিতান্ত অনুগত ছিল। প্রভুর কথা শুনিয়া সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"হে দেবপুত্র, আমিও আর গৃহে যাইব না। এই অরণ্যের মধ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। আমি আপনার সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগের গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। অতএব আমাকে আপনার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দিন।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"তোমার সন্ন্যাস লইবার সময় এখনও আসে নাই। অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমার পিতা, পত্নী সকলে ভাবিত আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে আমার বৃত্তান্ত সবিস্তার নিবেদন করিও।"

ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন

ছন্দক তথা হইতে অধোবদনে ফিরিয়া গেল। কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন করিতে তাহার সাত দিন লাগিয়াছিল। যে স্থান হইতে ছন্দক প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেই স্থানে মহারাজ অশোক এক প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। ইহা "ছন্দক নিবর্ত্তন স্তূপ" বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং সেই স্থানকে এখনও ঐ প্রদেশের লোকেরা "মহাস্থান" বলিয়া ডাকে।

তালপুকুর

(রমেশচন্দ্র দত্ত।)

গ্রীষ্মকালে তালপুকুর গ্রাম

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারিদিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্রে চাষ দিয়াছে, গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই একজন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগিনী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে, রাশি রাশি বাঁশ

হইয়াছে, এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলীবৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার, মোনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্যপথ পূরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটগাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকার-পূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষিগণ কুলায়ে নীরব হইয়া রহিয়াছে; কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্টস্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

কুটীরদৃশ্য

সেই তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটি ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫।৬টি নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের একপার্শ্বে একটি মাচানের উপর লাউগাছে লাউ রহিয়াছে, অপর দিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটি রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটি গোয়ালঘরে একটি মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই একখানি কাপড় শুখাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটি তক্তাপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটি ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটি কুলগাছ, কয়েকটি কলাগাছ, ও একটি আঁব গাছ, আর অনেক কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটি ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর

গৃহিণী নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার একটি তিন বৎসরের

শয়নকক্ষ

কন্যা ভূমিতে মাতুরের উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটি ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী ধীরে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক একবার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক একবার গুণ্‌গুণ্‌ শব্দে ঘুম পাড়াইবার ছড়া গাহিতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল. মাতা নিদ্রিত শিশুকে সযত্নে মেজেতে মাতুরের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া ক্ষণেক পাথার বাতাস করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে। স্থির প্রশান্ত, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুইটি সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে মাতার স্নেহ—মাতার যত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার অসীম সহিষ্ণুতা লক্ষিত হইতেছে। শরীর-খানি ক্ষীণ কিন্তু সুগঠিত। ক্ষীণ সুগঠিত বাহুদ্বারা নারী ধীরে ধীরে পাথার বাতাস করিতেছিলেন, আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাঁহার কত চিন্তা উদয় হইতেছিল। সংসারের চিন্তা. এই সুখদুঃখ পূর্ণ জগতের চিন্তা, আর কখন কখন পূর্ব্বকালের চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে সেই রমণীর হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

ছেলে বেশ ঘুমাইয়াছে। তখন মাতা পাথাখানি রাখিয়া আপন বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া ছেলের পাশে মাটীতে শুইলেন, নয়ন

নিদ্রা

দুইটি ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, তিনি অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে ঘরটিও নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় সন্তান দুটির পার্শ্বে স্নেহময়ী মাতা নিদ্রিত হইলেন। সংসারের অশেষ ভাবনা ক্ষণেক তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল, সেই শান্ত, সহিষ্ণু, চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে চিন্তার দুইটি রেখা অপনীত হইল।

মহেশ্বর মন্দির

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী-তীরে প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির ছিল। অনেক দূরদেশ হইতে অনেক লোক এই মন্দিরে প্রতিদিন সমাগত হইত। বৃদ্ধাগণ পুত্রকন্যার কুশল কামনা করিয়া পূজা দিতে আসিতেন; চির রোগিগণ রোগশান্তিকামনায় এই মন্দিরে আসিতেন; যোদ্ধৃগণ জয়াকাঙ্ক্ষায়, কৃপণগণ ধনাকাঙ্ক্ষায়, যুবকগণ বিদ্যাকাঙ্ক্ষায়, নানা প্রকারের লোক নানা আকাঙ্ক্ষায় এই মন্দিরে সমবেত হইত। বহুকালের ধন সঞ্চিত হইয়া এই মন্দিরে রাশীকৃত হইয়াছিল, মন্দিরের অট্টালিকাসমূহ দিন দিন দীর্ঘায়ত হইতেছিল। মধ্যে উচ্চ মন্দির, তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ, উজ্জ্বল, উন্নত সৌধমালা শোভা পাইত। আগন্তুকগণ এই সৌধমালায় বাস করিত, তাহা হইতে যে আয় হইত, তাহাও দেবসেবায় অর্পিত হইত।

মহেশ্বরের মন্দির

এই প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী মন্দিরের চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি বিস্তীর্ণ। সুতরাং মন্দিরের যে কোন দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে কেবল সৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না।

মন্দির ও সৌধমালা

এই সৌধমালার ভিতর দিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইবার জন্য চারিদিকে চারিটি সিংহদ্বার ছিল। শিবিকা কি শকট সেই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধন-গৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্নতাই স্থান পাইত না। রাজকুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইতেন, ভস্মবিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্র পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্ম্মের সম্মুখে উচ্চ কে? নীচ কে? ধনীই বা কি? দরিদ্রই বা কি?

মন্দিরের প্রাঙ্গণ

যদিচ চারিদিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ,

তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে, সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত। তথায় যে কেবল উপাসকগণ আসিত, এমত নহে; নানা প্রকার লোক নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত। বালকবালিকার জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্রব্য, যুবক-যুবতীদিগের জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্যই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রীত হইত। ক্রেতৃগণ তথায় দিবানিশি ব্যস্ত থাকিত।

নানা লোকের সমাগম

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশপটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্য-মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে,—সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে,— যেস্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল, এক্ষণে সেইস্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষ-পত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা নয়নরঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই; কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে;—কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হাম্বারব শুনা যাইতেছে;—কেবল দূরস্থ গ্রামবাসীদিগের গীত গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সে স্থানে, সেই গান শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

নিশীথে চন্দ্রালোকে

সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটি করিয়া লোক সমবেত হয়; মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! আমাদের জীবনেও এইরূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; যৌবনে সেই প্রবৃত্তিসমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ,—যেন জগৎসংসারকে গ্রাস করিবে; বার্দ্ধক্য ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্তসাগরে লীন হইয়া

চিন্তা ও ভাবের খেলা

যায়। তবে এত ধূমধাম কেন?—এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন?—কে বলিবে কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশ-দিকে ধাবমান্ হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্তমধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃকালের রবিকিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতিঃ বিস্তার কেন?

ইটোয়া

ইটোয়া

গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণে যমুনার সুরম্যতট হইতে নিকটবর্ত্তী ইটোয়া জেলার গ্রাম্যশোভা সন্দর্শন করিলে অনুমান হয়, যেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠসৌভাগ্যশ্রী ভোগাসক্ত রাজাদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া ঐ অপূর্ব্ব প্রদেশে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এরূপ রমণীয় স্থান ভারতবর্ষে অধিক দৃষ্ট হয় না—প্রায় ভূমণ্ডলের সমুদায় স্বাভাবিক সুন্দর পদার্থ ঐ স্থানে একাধারবর্ত্তী হইয়া আছে।

যমুনাঘাট

মোগল সম্রাট্দিগের আধিপত্যকালে উক্ত জেলা যাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত ছিল, এখন তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। অধুনা, পূর্ব্বসম্পদ্-গরিমার যে কয়েকটি চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, যমুনাঘাট তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ঐ ঘাটের এক পার্শ্বে একটি মনোহর দেবালয় এবং অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি মনোহর বৃক্ষ সুশীতল ছায়া রচনা করিয়া গ্রীষ্মকালে ঐ স্থানকে পরম রমণীয় করিয়া তুলে। এই নিমিত্ত নিদাঘমধ্যাহ্নে ক্লান্ত পথিকেরা শ্রম দূর করণার্থ ঐ স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে। কোন্ সময়ে এই অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল,

তাহার নিরূপণ হয় নাই। যমুনাঘাটের উপর একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়, উহা যমুনাতট হইতে কিয়দ্দূর বিস্তৃত হইয়া আছে।

বর্ষাকালে নদীজল উচ্ছ্বসিত হইয়া সন্নিহিত প্রদেশ প্লাবিত করে বলিয়া, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পর্ব্বতমালার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থান নিবিড় বনে আচ্ছন্ন—মনুষ্যের গতায়াত নাই। হিংস্রস্বভাব জন্তুসকল ঐ অরণ্য মধ্যে বাস করে। প্রবাদ আছে যে, তত্রত্য লোকেরা রজনীকালে প্রায়ই বাটীর বাহির হয় না। লোকালয় হইতে বন দূরবর্ত্তী নহে। গ্রীষ্মকালে আরণ্য-জন্তুসকল বন হইতে বহির্গত হইয়া লোকালয়ের অদূরবর্ত্তী উদ্যানের মধ্যে নিভৃতস্থানে লুকাইয়া থাকে এবং দ্বার আবদ্ধ না রহিলেই অনায়াসে মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। শজারু প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু উদ্যান মধ্যে নিয়ত ভ্রমণ করে এবং তত্রত্য শস্য ও নবীন তরু সকল বিনষ্ট করে। কিন্তু এতদপেক্ষা ভয়াবহ তক্ষক ও বন্যবিড়াল। ইহারা গৃহের চালের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। এইজন্য প্রায় সকল গৃহস্থ গৃহের অভ্যন্তরে একটি চন্দ্রাতপ আবৃত না করিয়া বাস করিতে পারে না।

বন ও বন্যজন্তুর উপদ্রব

এই জেলার মধ্যে বিভিন্নজাতীয় চিত্রিত বিহঙ্গ দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত বিহঙ্গের লাবণ্য আমেরিকা দেশের পরম সুন্দর [illegible] শ্রেণীকে পরাভব করিয়াছে। এখানে রক্ত, পীত, হরিৎ প্রভৃতি সর্ব্ব বর্ণেরই কপোত দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন নীল পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের পতত্রিকুল কাননের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

বিহঙ্গ

ইটোয়া জেলার মধ্যে পুষ্পেরও বাহুল্য দৃষ্ট হয়। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ কবরী পুষ্পের মনোহারিতায় কমলিনীও লজ্জিতা হয়। উহার সুগন্ধ বহুদূরব্যাপক বলিয়া উহা পুষ্পরাজ নামে খ্যাত। উহা প্রভাতকালে বিকশিত হইয়া বন আমোদিত করে। ইহার বর্ণ রক্ত, শ্বেত প্রভৃতি বিবিধপ্রকার হইয়া থাকে। এতৎপ্রদেশে বাবলা বৃক্ষ ও লজ্জাবতী লতা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইটোয়া জেলায় একজাতীয় দীর্ঘলতা জন্মিয়া থাকে উহার কুসুম প্রভাতে প্রস্ফুটিত হইবার সময়ে স্থলপদ্মের ন্যায় সম্যক্

পুষ্প ও অন্যান্য তরুলতা

শ্বেতাভ উপলব্ধ হয়। দুই ঘণ্টা পর, আলক্ত বর্ণ এবং ততোহধিক বিলম্বে সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণ প্রতীয়মান হয়। তাল, নিম, অশ্বত্থ প্রভৃতি উন্নত পাদপদ্বারা গ্রামভূমি সর্ব্বক্ষণ নিবিড় বোধ হয়। উদ্যানবিহারার্থ তথায় ধনিব্যক্তিদের বহুতর সুরম্য উপবন রহিয়াছে—যমুনার সুনীল সলিলোপরি প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হইলে, তন্মধ্যে নীলকান্ত-মণির অলৌকিক কান্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

পতঙ্গ

পুষ্পসদৃশ বিবিধবর্ণবিভূষিত মরকতকান্তি নানারূপ পতঙ্গ-শ্রেণীও এথানে দৃষ্ট হয়। ইহারা নানা বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারু-চিত্রিতকান্তি প্রজাপতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য।

পূর্ব্ব ইতিহাস

হিন্দু নৃপতিবৃন্দের আধিপত্যকালে ইটোয়া জেলা কান্যকুব্জ-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। কিন্তু মোগলরাজত্বকালে ইহা একটি স্বতন্ত্র সুবা বলিয়া পরিগণিত হয়। মোগল আধিপত্য বিলুপ্ত হইলে, অযোধ্যার নবাবদিগের অধীন হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেস্‌লী, অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলির নিকট হইতে উহা বৃটিশাধিকারভুক্ত করেন। ইহা আগরা নগর হইতে ছাব্বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যমুনা

যমুনাই ইটোয়া রাজ্যের প্রধান নদী। হিমালয়ের যমুনেত্রী পর্ব্বত-শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া মসূরী, সাহারাণপুর থানেশ্বর, পাণিপথ, দিল্লী, আগরা প্রভৃতি নগর পর্য্যটনপূর্ব্বক প্রয়াগে গঙ্গা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া যুক্তবেণী সম্পন্ন করিয়াছে। যমুনাগর্ভে অনেকগুলি সৈকত দ্বীপ আছে; কিন্তু তাহা বর্ষার জলাধিক্যে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়।

বিশ্বপ্রেম

সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমরা কান্দি। রোদন করাই সংসারের নিয়ম; হাস্য তাহার ব্যাভিচার মাত্র। যে শূন্য-চিত্ত সেই হাসে; যে কিছু বুঝে না সেই হাসে; যে অজ্ঞ সেই হাসে—কেন না, অজ্ঞতা শান্তিপ্রদ। আর যে চিন্তাশীল সেই দুঃখী; যে সংসার চিনে সেই কান্দে। আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করি;-- আর সেই দিন যে প্রস্রবণ খুলিয়াছে, তাহা আর ইহজন্মে শুখাইল না। অনেক সময় মনে করি, এ মনুষ্য-জন্ম কেন? কেহ বলিতে পারে না কেন? আমার বোধ হয়, কান্দিবার জন্যই মনুষ্য জন্ম।

ক্রন্দন—হাস্য

রোদন করা কি দৌর্ব্বল্য? আমি যে এত কান্দি, আমি কি দুর্ব্বল? রোদন করা দৌর্ব্বল্য নহে। দুর্য্যোধন শত্রু; তবু ভীম যখন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিল, তখন যুধিষ্ঠির কান্দিলেন। ঈশা মনুষ্যজাতির দুঃখে দুঃখিত হইয়া কান্দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাবণের জন্য কান্দিয়াছিলেন। শাক্য-সিংহ মনুষ্যজাতির দুঃখে কান্দিয়াছিলেন। মনুষ্যের দুঃখ নিবারণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন—রাজ্য ছাড়িয়া, মাতাপিতা ছাড়িয়া, পত্নী ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন—শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। তাই বলিয়াছি ত রোদন করা দৌর্ব্বল্য নহে।

রোদন করা দৌর্ব্বল্য নহে

যে কখন কান্দে নাই সে নীচ। তবে আমি কান্দি বলিয়া আমি দুর্ব্বল কেন? তাঁহাদের রোদনে আর আমার রোদনে প্রভেদ কি? প্রভেদ অনেক,—তাঁহারা পরের জন্য রোদন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। আমি আপনার জন্য কান্দি; সুতরাং আমি ক্ষুদ্র, আমি দুর্ব্বল, আমি সামান্য। আমার রোদনে স্বার্থপরতা আছে, তাই আমি কান্দি ত জানিয়াও দুর্ব্বল। আমার নিজের সুখের অবসান হইয়াছে বলিয়া আমি কান্দি, তাই আমি দুর্ব্বল। যে পরের জন্য আপনাকে ভুলিতে পারে

রোদনে স্বার্থপরতা

না, সে-ই দুর্ব্বল, সে-ই সামান্য, সে-ই ক্ষুদ্র। যে পারে সেই মহৎ, সেই ধন্য, সেই প্রাতঃস্মরণীয়।

জাহ্নবি! কুল্‌কুল্‌—কুল্‌কুল্‌—তুমি এই গীত গাহিতেছে। বায়ু কি বলিয়া বলিয়া তোমার তীরে ঘুরিতেছে। তীরস্থ বৃক্ষরাজি, শাখাহস্ত নাড়িয়া, মস্তক দোলাইয়া কি বলিতেছে। তদবলম্বিনী বল্লরী থাকিয়া থাকিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। সকলেরই কি ভাষা আছে? আছে বৈ কি। আমাদের সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা নাই বলিয়া আমরা তাহা বুঝি না। কিন্তু আমি আজ বুঝিতেছি। তোমার সলিলশীকরবাহী সমীরণস্পর্শে দিব্য কর্ণ পাইয়াছি, তোমার তীরে সৈকতাসনে বসিয়া দিব্যজ্ঞান পাইয়াছি, তাই আজ স্থাবরজঙ্গমের কথা বুঝিতেছি। লতা বলিতেছে—দেখ অনন্ত নীলবিস্তৃতিমধ্যে ঐ সুন্দর চাঁদ, পুণ্যসলিলা এই জাহ্নবী, দক্ষিণ মারুতের এই হিল্লোল,—আমি সুখী, তাই দুলিতেছি, কেননা যেই সুখী, সেই চঞ্চল, সেই অস্থির। বায়ু বলিতেছে—দেখ, কি রাজোদ্যানে, কি দুর্গম অরণ্যে, যেখানে যে ফুলটি ফুটে, তাহার সুগন্ধ আমি তোমাদের জন্য বহন করিয়া বেড়াই—আমার কোন লাভ নাই, তবু পরের বোঝা মাথায় বহিয়া বেড়াই—যে না লইতে আইসে, তার ঘরে গিয়া দিয়া আসি—অতএব নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতই পরম ধর্ম্ম। বৃক্ষ বলিতেছে—দেখ, যে আমাকে ছেদন করিতে আইসে, তাহাকেও ছায়াদানে আমি বিমুখ নহি—অতএব শত্রুকে স্নেহ করাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

দিব্যদৃষ্টি

যে সুখী সেই চঞ্চল

নিঃস্বার্থ পরহিতব্রত

শত্রুর প্রতি স্নেহ

যে মিত্র তাহাকে কে না ভালবাসে? আর জাহ্নবি, তুমি বলিতেছ,—'দেখ, আমি দেবী; আমার নিজের সুখ দুঃখ নাই—কেবল তোমাদের জন্য কাঁদি, কেননা, তোমাদিগকে আমি ভালবাসি, এবং যে ভালবাসে সেই কান্দে। কিন্তু আমার রোদনের পরিণাম আছে। আমি স্নেহ ছড়াইতে ছড়াইতে গিয়া অবশেষে অনন্ত সাগরে মিশাই; তখনও যে আমি, সেই আমিই থাকি, তোমাদের জন্য যে অপার স্নেহ, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে, কেবল স্নেহজনিত রোদন থাকে

স্নেহের অনন্ত বিস্তৃতি

না—কেবল কুল্‌কুল্ থাকে না—অতএব স্নেহকে অনন্ত বিস্তৃতিগত করাই পরম পুরুষার্থ।

সমগ্র মানবজাতিকে স্নেহ করাই প্রকৃত সুখ; কেন না, এ প্রণয়ে বিরহ নাই—একজন গিয়াছে; সেই শূন্য সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও স্থান দি, সেও যাইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যজাতি ত কখন যাইবে না—ব্যক্তিবিশেষ মরিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যজাতি ত কখন মরিবে না। যদিই যায়,—আমাকে ত তাহা দেখিতে হইবে না, তাই বলিতেছিলাম, এ প্রণয়ে বিরহ নাই। তাই বটে,—আমি একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই আমি দুঃখী। যদি সমগ্র মানব জাতিকে অথবা সমস্ত ভারতবর্ষকে, অন্ততঃ সমগ্র বঙ্গদেশকে হৃদয়ে স্থান দিতাম, তাহা হইলে এত কান্দিতে হইত না—স্নেহজনিত সুখ থাকিত, অথচ স্নেহজনিত দুঃখ থাকিত না।

বিশ্বজনীন প্রেম

প্রবন্ধ-রত্ন

চতুর্থ খণ্ড

অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য

শ্রমপ্রবৃত্তিতে অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সঞ্চার হয়। একাগ্রহৃদয়ে ও ধৈর্য্যসহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য পরিশ্রমের সহচর না হইলে, সংসারে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যাঁহারা শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত হন নাই।

অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য

মানবের পুরোভাগে বিবিধ বিষয় রহিয়াছে। মানব আত্মোন্নতি বা সমাজের উপকারের জন্য, এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তৎপরতার পরিচয় দিতেছেন। কেহ কেহ জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিতেছেন। কেহ কেহ অত্যাচারী অরাতিকুল পরাজিত করিয়া, শান্তির প্রাধান্য অব্যাহত রাখিতেছেন। কেহ কেহ বা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা লোকের উন্নতিপথ প্রশস্ততর করিয়া দিতেছেন। এইরূপে যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহারা যদি সেই সেই বিষয়ে, ধীরভাবে মনঃসংযোগ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম ফলজনক হইত না। উচ্ছৃঙ্খলভাবপ্রযুক্ত তাঁহারা প্রত্যেক উদ্যমে উদ্ভ্রান্ত, প্রত্যেক সঙ্কল্পে নিরুৎসাহ এবং প্রত্যেক কার্য্যে অকৃতার্থ হইতেন।

মানবের তৎপরতা

মানবের উন্নতিপথ যত কণ্টকর দেখা যায়, তৎসমুদয়ের উন্মূলন করিতে হইলে, উৎসাহ, কার্য্যতৎপরতা, অধ্যবসায়, সর্ব্বোপরি অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য প্রকাশ করা উচিত। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগ করিলে, কেহ কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে চাহেন, মনোযোগসহকারে তাঁহাকে সেই বিষয়ে পরিশ্রম করিতে হয়। মনোযোগের

মনোযোগিতা

সম্পূর্ণতা না ঘটিলে, কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না। গ্রন্থপাঠে কোন বিষয় শিখিতে হইলে, গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত। যিনি অধীরভাবে একবার এক গ্রন্থে পুনর্ব্বার অন্য গ্রন্থে নয়না-বর্ত্তন করিয়া কোন বিষয় শিখিতে চাহেন, তিনি কিছুই শিখিতে পারেন না। অভিনিবেশসহকারে একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে, অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কিন্তু অধীরভাবে বহুপুস্তক পড়িলেও, কোন ফল হয় না। ফলতঃ অভিনিবেশ ও ধৈর্য্যের সহিত পরিশ্রম না করিলে, সেই পরিশ্রম সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হয়।

অভীষ্ট বিষয়ে অভিনিবেশ

নিউটন মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করিয়া, জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার যেমন অসামান্য প্রতিভা, সেইরূপ অনন্য-সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অপ্রমেয় শ্রমাসক্তি ছিল। তিনি কিরূপে নানা বিষয়ের আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এক ব্যক্তি তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, নিউটন বিনম্রভাবে কেবল বলিয়া-ছিলেন—"নিরন্তর নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের পরিচিন্তন দ্বারা।" তিনি অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমি যে বিষয়ের অনুশীলন করি, সেই বিষয় সর্ব্বদা আমার মনোমধ্যে জাগরূক থাকে ; জ্ঞানালোক ধীরে ধীরে আবি-র্ভূত হইয়া, যে পর্য্যন্ত উজ্জ্বলভাব পরিগ্রহ না করে, সেপর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকি।" যাঁহারা জ্ঞানগৌরবে সভ্য সমাজের বরণীয় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই অভীষ্ট বিষয়ে এইরূপ অভি-নিবিষ্ট থাকিতেন।

রঘুনাথ শিরোমণির শিক্ষারম্ভ

অস্মদ্দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে, ধৈর্য্যসহকৃত অভিনিবেশের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে নবদ্বীপে রঘুনাথের আবির্ভাব হয়। রঘুনাথ

এক চক্ষুহীন ছিলেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হন। তদীয় পিতা নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন ; পত্নী ও পুত্রের অন্নসংস্থান হয়, এরূপ কোন সম্বল রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং ভিক্ষাবৃত্তি রঘুনাথের দুঃখিনী জননীর জীবিকানির্ব্বাহের অবলম্বন হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশের ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে উক্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। রঘুনাথের মাতা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর কোন ছাত্রের গৃহকর্ম্মে নিয়োজিতা হন। ঘটনাক্রমে বাসুদেব সার্ব্বভৌম রঘুনাথের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রাধ্যয়ন

রঘুনাথ অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার এরূপ মনঃসংযোগ ছিল যে, তিনি অধ্যাপকের নিকট যাহা শিখিতেন, রাত্রিকালে তাহা লিখিয়া স্বীয়ভাবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেন ; অধ্যাপকের কোন মত যুক্তিবহির্ভূত হইলে উহার খণ্ডন করিয়া, পরদিন অধ্যাপককে স্বীয় মত জানাইতেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথের সহিত শাস্ত্রানুশীলন করিতেন, রঘুনাথ সহাধ্যায়ীর অসামান্য প্রতিভার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে যাহা সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা চৈতন্য দেবের মতের সহিত মিলাইয়া লইতেন।

রঘুনাথের অভিনিবেশ—চৈতন্যদেব

একদা রঘুনাথ কোন বৃক্ষতলে বসিয়া, ন্যায়শাস্ত্রঘটিত বিষয় ভাবিতেছিলেন। প্রগাঢ় অভিনিবেশে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। বৃক্ষস্থিত বিহঙ্গের বিষ্ঠা তাঁহার গাত্রে পতিত হইলেও, তিনি অন্যমনস্ক হয়েন নাই। রঘুনাথ অভিনিবেশসহকারে চিন্তনীয় বিষয়ের

সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন; এমন সময়ে চৈতন্যদেব ভাগীরথীতে স্নান করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি পথে দেখিলেন যে, তাঁহার চিন্তাশীল সহাধ্যায়ী বৃক্ষমূলে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি কৌতূহল-প্রযুক্ত রঘুনাথের সমীপবর্ত্তী হইলেন, এবং হস্তস্থিত পাত্র হইতে জল লইয়া তাঁহার গাত্রে নিক্ষেপপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন "ও ভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছ?" চৈতন্যদেবকে সম্মুখে দেখিয়া একচক্ষু রঘুনাথের উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইল। তিনি চৈতন্যদেবকে চিন্তনীয় বিষয়টি জানাইলেন। চৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ উহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। রঘুনাথ আপন সিদ্ধান্তের সহিত ঐ সিদ্ধান্তের ঐক্য দেখিয়া বিস্ময়সহকারে সহাধ্যায়ীকে কহিলেন "ভাই! আমি এত-ক্ষণ চিন্তার পর যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছিলাম, তুমি শ্রবণমাত্র তাহার মীমাংসা করিয়া দিলে, ইহাতে বোধ হয় তুমি সামান্য মানুষ নহ"। শেষে বঙ্গের এই দুই মহিমান্বিত পুরুষ বিভিন্ন পথে পদার্পণ করেন। চৈতন্যদেব ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া সংসারিক বিষয়ে বিসর্জ্জন দেন। রঘুনাথ অসামান্য অভিনিবেশ ও ধৈর্য্যের গুণে তৎসমকালে ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া, সংসারে থাকিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থ এখন সমগ্র সভ্যসমাজে বঙ্গের গৌরব ঘোষণা করি-তেছে। ধীশক্তিশালী তার্কিকগণ এখন ভক্তিভাবে উহার নিকটে মস্তক অবনত করিতেছেন।

অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য শিক্ষার মূল—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

অভিনিবেশ ও ধৈর্য্যের সহিত পরিশ্রম করিলে, বাল্যে হউক, যৌবনে হউক, প্রৌঢ়ে হউক, কোনকালে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় না। অনেকে, অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া শিক্ষায় নিরস্ত থাকেন। তাঁহারা অভিনিবেশ সংবলিত ও ধৈর্য্যসহকৃত পরিশ্রমের কার্য্য-

কারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কর্ম্মপ্রাণ পুরুষ অধিক বয়সে ও বিবিধ বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করিয়া যশস্বী হয়েন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ পঞ্চাশৎবর্ষ বয়সে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। অভিনিবেশবলে এই শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা জন্মে। তিনি সর্ব্বপ্রথম সৌদামিনীকে জলদমালা হইতে ভূতলে আনয়ন করেন। স্কট্‌লণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখক স্যর্ ওয়াল্টার স্কট্ চল্লিশ বৎসর বয়সে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ এখন সুধীসমাজে সাদরে পঠিত হইতেছে। ইংলণ্ডের তমাস স্কট্-নামক এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চষষ্টি বৎসর বয়সে হিব্রু ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কারের বাল্যকাল

নবদ্বীপের জগদীশ তর্কালঙ্কার পাণ্ডিত্য-গৌরবে চির-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জগদীশ বাল্যকালে দুঃশীল ও অনাবিষ্ট ছিলেন। তিনি বৃক্ষস্থিত কুলায় হইতে পক্ষিশাবক গ্রহণ করিয়া আমোদিত হইতেন, নানা স্থানে উৎপাত করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এইরূপে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। একদা তিনি পক্ষিশাবক-গ্রহণের জন্য কোন উচ্চ তালবৃক্ষে উঠিয়া, কুলায়ে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, সহসা একটি সর্প কুলায় হইতে বহির্গত হইয়া ফণাবিস্তারপূর্ব্বক দংশনে উদ্যত হইল। জগদীশ ইহাতে চলচিত্ত না হইয়া উপস্থিতবুদ্ধিবলে সর্পের মুখ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন, এবং তালপত্রের সুতীক্ষ্ণ ডালদ্বারা উহার গলদেশ ও দেহের অন্যান্য অংশ কাটিয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে নামিলেন। বৃক্ষের অদূরবর্ত্তী স্থানে একটি সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি জগদীশের প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন, স্নেহসহকৃত মধুর

বাক্যে তাহার অস্থির চিত্ত শান্ত করিলেন, পরিশেষে বিবিধ সদুপদেশ দিয়া, তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হইতে কহিলেন। জগদীশ উক্ত বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুসারে বিদ্যা শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। এ বয়সে তিনি বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিনিবেশ বিচলিত, ধৈর্য্য অন্তর্হিত বা শিক্ষাপ্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইল না। তিনি বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন।

শিক্ষার চেষ্টা ও অভিনিবেশ

জগদীশ দরিদ্র ছিলেন; রাত্রিকালে আলোকের জন্য তৈল সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তৈলের অভাবে তাঁহার পাঠ বন্ধ থাকিত না। তিনি শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া, রাত্রিকালে গ্রন্থ পাঠ করিতেন। এইরূপ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া জগদীশ ক্রমে সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইল। তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, অসামান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এক্ষণে ন্যায়শিক্ষার্থিগণ আদরসহকারে জগদীশের গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত যাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না, তিনি অসামান্য অভিনিবেশে ও ধৈর্য্যের সহিত পরিশ্রম করিয়া, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়েন। অভিজ্ঞতাবলে পণ্ডিতসমাজে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ দ্বারা আত্মোন্নতি ও সিদ্ধিলাভ

পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী ও অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যে অবস্থায় পতিত হউন না কেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই আত্মোন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। স্রোতস্বতীর আবেগময়ী জলধারা যেমন সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তিনিও

সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েন। তাঁহার সাধনা কিছুতেই ব্যাহত হয় না। তিনি বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও সিদ্ধি লাভ করিয়া, আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইয়া থাকেন।

ভূদেব ও মাইকেলের জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব

ভূদেব ও মধুসূদন

ভূদেব দরিদ্র অধ্যাপকের পুত্র। তাঁহার পিতা কলিকাতায় বাস করিতেন। অধ্যাপনা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহা হইতে তিনি অতিকষ্টে পুত্রের ইংরাজী শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কথিত আছে, এক সময় অর্থাভাবে ভূদেবের পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার সহাধ্যায়ী মধুসূদন এ বিষয় জানিতে পারিয়া, মাতার নিকটে যে টাকা পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে বৃত্তি পাওয়াতে ভূদেবকে এই সাহায্য লইতে হয় নাই। কালক্রমে, বঙ্গের এই প্রতিভাশালী পুরুষদ্বয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়া, চিরস্মরণীয় হন। যাহা হউক, ভূদেব দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন না হইয়া, মনোযোগের সহিত হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন।

ইংরাজিশিক্ষিত ভূদেবের জাতীয়ভাব

ভূদেব ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন; সেই সাহিত্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্নরাশির সৌন্দর্য্যপরিগ্রহে সামর্থ্য দিয়াছিল। তিনি ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাকে জাতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিশ্ববিমোহিনী শক্তিপরিজ্ঞানে অধিকারী করিয়াছিল। তিনি ইংরাজী ইতিহাস পাঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তাঁহাকে জাতীয় ইতিহাসের মহত্ত্ব-

রক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়াছিল। তিনি বিদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনা করিয়া অধঃপতিত আত্মজাতিকে জাতীয় ভাবে শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এইরূপ বলবতী ছিল।

সংস্কৃত শি[illegible] প্রভাবে বিজাতীয়ভাব রুদ্ধ ও শক্তিশূন্য

ভূদেব প্রথমে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুই বৎসর মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি প্রথমে মুগ্ধবোধপাঠে তাদৃশ যত্ন প্রকাশ করেন নাই। শেষে সংস্কৃত ভাষাই তাঁহার চিত্তবিনোদনের প্রধান বিষয় হয়। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতাগর্ব্বে অধীর হইয়া তিনি সংস্কৃত বা বাঙ্গলার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। তিনি সংস্কৃতে অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া, শিক্ষিতসম্প্রদায়কে বিস্মিত করিয়া তুলেন।

হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ-গ্রহণ

ভূদেব যেরূপ ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। যেরূপ ইংরাজ-সমাজের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশীয় সমাজেরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংরাজের জাতীয় প্রকৃতির সহিত আপনাদের জাতীয় প্রকৃতি মিলাইয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজের নিকটে যাহা কিছু শিখিলে আপনাদের জাতীয় সমাজের সঞ্জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, তিনি স্বদেশায়-দিগকে তাহাই শিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইংরাজ অধ্যাপকের প্রদত্ত শিক্ষায় ইংরাজী ভাষায় তাঁহার

অসামান্য ব্যুৎপত্তিলাভ হয়। তিনি ইংরাজী রচনায় অভ্যস্ত, ইংরাজীতে কথোপকথনে সুদক্ষ এবং ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের ভাবগ্রহণে সুনিপুণ হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই কবিতার আদর করিতেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত কবিতার প্রতি তদীয় অনুরাগ ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভ করিয়া তিনি ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া আমোদিত হইতেন। ইংরাজীকাব্য পাঠে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইত। ইংরাজ দার্শনিক, ইংরাজ ঐতিহাসিক, তাঁহার দূরদর্শিতা-বৃদ্ধির সহায় হইতেন। কিন্তু ইংরাজ অধ্যাপকের উপদেশে, ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের রচনাপাঠে তিনি বহুদর্শী হইলেও হৃদয়ের ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মনের শিক্ষা যথোচিত হইয়াছিল, হৃদয়ের শিক্ষা কিছুই হয় নাই। তিনি পাশ্চাত্য কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাব্য, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হয় নাই।

মাইকেলের ইংরাজী-শিক্ষা ও হৃদয়ের অনুন্নত ভাব

মাইকেল সাধনাবলে ভাষাবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। আটটি প্রধান ভাষা তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি একদিকে যেমন বাঙ্গালা, সংস্কৃত, তেলেগু প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভাষার আলোচনা করিতেন, অপরদিকে সেইরূপ হিব্রু, গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয় প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন।

বিবিধ ভাষা শিক্ষা

হিন্দুকলেজে মধুসূদনের অনেক সতীর্থ ছিলেন ; ইঁহারাও কার্য্যক্ষমতায়, পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিগুণে সমাজে যথোচিত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু, মধুসূদনের ন্যায়

মাইকেলের বুদ্ধিভ্রংশ

ইঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। ইঁহারা সকলেই এক গুরুর নিকটে এক শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইতেন; এক গুরুর মুখে উপদেশ শুনিতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ইঁহাদের সকলের সমক্ষেই প্রসারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য রীতিনীতি সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন ঐ জ্ঞানালোকে যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত, ঐ সভ্যতায় যেরূপ আকৃষ্ট, ঐ রীতিনীতিতে যেরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, অপরে সেরূপ হন নাই।

ভূদেব ও মাইকেলের পার্থক্য

মধুসূদন যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মার্গগামী হইয়াছিলেন; মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ভূদেব তাহার আকর্ষণে স্খলিতপদ হন নাই। মধুসূদন জাতীয়ভাব পদদলিত করিয়াছেন: ভূদেব জাতীয় ভাবের প্রাধান্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

শ্লথ্

শ্লথ্ পশুর নাম বহুকালাবধি ইউরোপীয় লোকসমাজে বিদিত আছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত বিবরণ অনেকেই অবগত নহেন। ইতিপূর্ব্বে সকলের ধারণা ছিল যে, শ্লথ পশুর তুল্য অলস ও অনুৎসাহী প্রাণী আর নাই। ইহারা সর্ব্বদাই বেদনা ভোগ করে, কদাপি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। যে বৃক্ষে আরোহণ করে, ক্রমশঃ তাহার ফল, পুষ্প, পত্র, বল্কল সকল ভক্ষণ করিয়া ইহারা দুই চারি দিন অনাহারে থাকে, তথাপি ঐ বৃক্ষ হইতে অন্যত্র যাইবার চেষ্টা পায় না। অবশেষে ক্ষুধার যাতনা অসহ্য হইলে, বৃক্ষের শাখা ছাড়িয়া দিয়া ভূমিতে পতিত হয়। এই পতনে ইহাদিগের দেহে অত্যন্ত বেদনা লাগে এবং সেই বেদনায় দুই তিন দিন ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে থাকে—অন্যত্র গমন করিতে পারে না। পরন্তু, ঐ বেদনার সম্যক্ সম্ভাবনাসত্ত্বেও ইহারা শ্রম-স্বীকার করিয়া যথানিয়মে শাখা হইতে অবতরণ করে না। অতঃপর, সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া দশ পনর পাদস্থান অগ্রসর হইয়া দুই চারি দিনে আপন মনোনীত অন্য কোন বৃক্ষোপরি আরোহণ করে এবং যে পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ছাল কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সে পর্য্যন্ত তথা হইতে অন্যত্র গমন করে না। এই অনুদ্যোগিতা-প্রযুক্ত ইংরাজেরা এই পশুর 'শ্লথ্' বা 'অলস' নাম রাখিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক—ইহার কিছুই প্রকৃত নহে।

শ্লথ্ পশু-বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা

জগদীশ্বর কোন জীবকেই এ প্রকারে সৃষ্টি করেন নাই,

যাহাতে তাহাকে সমস্ত জীবনব্যাপী বেদনায় কালযাপন করিতে হয়। সকল জীবেরই দেহযাত্রায় প্রচুর সুখ আছে। আমরা যাহাকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন মনে করি, তাহারও দুঃখের ভাগ হইতে সুখের ভাগ অধিক; এই নিমিত্ত সে জীবিত থাকিতে সর্ব্বদা মানস করে।

শ্লথ্ পশু অলস ও বেদনাকাতর নহে পরন্তু চঞ্চল ও ক্রীড়া-তৎপর

শ্লথ্ পশুর জীবনযাত্রা বেদনা-ক্লিষ্ট অবস্থায় নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইহা শুদ্ধ পিঞ্জরাবদ্ধ পশু দেখিলেই মনে হয়। কেন না, ভ্রমণকারিগণ এই জীবকে তাহার জন্মস্থান অরণ্যমধ্যে চঞ্চল, ক্রীড়া-তৎপর এবং সর্ব্বদা আমোদানুরক্ত থাকিতে দেখিয়াছেন।

প্রাণিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে অপুরোদন্তী জীব-শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করেন। কারণ, ঐ শ্রেণীর পিপীলিকাভুক্ বজ্রকীট প্রভৃতি জীবের ন্যায় ইহা-দের মুখের পুরোভাগে দন্ত হয় না। ইহাদিগের পদ-তলও হয় না। পদের পুরোভাগে কোন জাতীয় পশুর দুইটি, অপর জাতীয় পশুর তিনটি অঙ্গুলি হয়, তাহাতে দীর্ঘ নখ সংলগ্ন থাকে;—তদ্দ্বারা বৃক্ষশাখাদি অতি অনায়াসে ধারণ করা যায়, কিন্তু পদতল বা পা'র চেটো না থাকায় ভূমিতে বিচরণ করিবার কোন উপায় নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যকে ভূপৃষ্ঠে, পক্ষীকে আকাশে এবং বানরকে বৃক্ষোপরি বিচরণ করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনমত ইহারা পরস্পরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের বিশেষ কোন ক্লেশ হয় না। কিন্তু শ্লথ্ পশুর পক্ষে সে উপায় নাই। বিশ্বস্রষ্টা এই জীবদিগকে আজন্ম মৃত্যুপর্য্যন্ত বৃক্ষোপরি কালযাপন করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বৃক্ষশাখা হইতে ভূমিতে আনিলে, তাহারা ভূমিতে আনীত মৎস্যের ন্যায় নিতান্ত অচল

শ্লথ্ 'অপুরোদন্তী' জীবপর্য্যায়ভুক্ত—পদতল হীন

হইয়া পড়ে। মৎস্য যে প্রকারে ডানা বা কানাছ দিয়া অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়, ইহারাও সেই প্রকার ভূমিতে নখ আঁচড়াইয়া যৎকিঞ্চিৎ নড়িতে পারে; কিন্তু কোন মতেই স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। পিঞ্জরাবদ্ধ শ্লথ্ পশুকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া লোকে উহার অলসতা ও ক্লেশের গল্প কল্পিত করিয়া থাকিবে।

বৃক্ষবিচরণে শ্লথ্ পশুর বিশেষত্ব

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্লথ্ পশুর অঙ্গুলী বৃক্ষশাখা ধারণ করিতে অত্যন্ত পটু। সেই অঙ্গুলীর সাহায্যে ইহারা বৃক্ষোপরি কাঠবিড়ালের ন্যায় দ্রুতবেগে ভ্রমণ করে কিন্তু বৃক্ষান্তরে গমনকালে কদাপি ভূমিতে অবতরণ করে না। ইহাদের এই বিচরণের এক বিশেষত্ব আছে। অপর পশু বৃক্ষে বিচরণসময়ে শাখার উপর পৃষ্ঠে চলে; কিন্তু শ্লথেরা অধঃ-পৃষ্ঠে ঝুলিয়া চলে, কদাপি উপর পৃষ্ঠে যায় না। ইহাদিগের নিদ্রা এবং শাবকপ্রসব ঝুলিবার অবস্থায় নিষ্পন্ন হয়, এজন্য তাহাদের কোন পদার্থের উপর অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। কাঠবিড়াল ও ইন্দুর শাখার উভয় পৃষ্ঠে চলিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের প্রিয় পথ উপর পৃষ্ঠ। শ্লথ পশু কোন মতেই উপর পৃষ্ঠে চলিতে পারে না।

লোমের বিশেষত্ব

শ্লথ্ পশুর আর এক আশ্চর্য্য লক্ষণ আছে। অপর পশুদিগের লোম ও কেশমূল নিকটে স্থূল ও অগ্রভাগে ক্রমশঃ প্রতনু হয়। কিন্তু শ্লথের লোম অগ্রভাগে অত্যন্ত স্থূল এবং তথা হইতে ক্রমশঃ প্রতনু হইয়া মূল নিকটে মাকড়শার সূত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত কোমল হয়। এই লোমের বর্ণ বৃক্ষত্বকের ন্যায়; সুতরাং দূর হইতে শ্লথ পশুকে বৃক্ষোপরি দেখিলে তাহাকে বৃক্ষের শাখা বলিয়া ভ্রম হয়।

ওয়াটর্নিনামা একজন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে, তিনি এক সময়

একটা শ্লথ্‌পশু ধৃত করিয়া একটা বালির মাঠে ছাড়িয়া দেন; কিন্তু তথায় ঐ পশু এক পদও চলিতে পারিল না। তৎপরে তাহাকে একটা বৃক্ষশাখার নিকটে আনিলে, সে ক্ষণকালমধ্যে অতিবেগে বৃক্ষাগ্রে উঠিয়া এমন শীঘ্র বনমধ্যে প্রবেশ করিল যে, সে কোন্‌দিকে পলায়ন করিল, তাহার অনুসন্ধান করা অসাধ্য হইল!

ওয়ার্টনের পরীক্ষা

এই শ্লথ্‌ পশুর নিবাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। এখানকার অরণ্য ভিন্ন অন্যত্র কোথায়ও ইহা দৃষ্ট হয় না।

শ্লথের আবাসস্থল

ধাত্রী পান্না

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদয়সিংহনামক শিশু পুত্র রাখিয়া চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ, পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত কুশ্বানামক স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে, রাণা বিক্রমাজিৎ চিতোর-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার কাপুরুষতায় বিরক্ত হইয়া সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, বনবীরকে চিতোর-সিংহাসন প্রদান করেন।

শিশুরাণা উদয়সিংহ

হতভাগ্য অদূরদর্শী মূর্খ বিক্রমাজিৎ পদচ্যুত হইয়া চিতোরের রাজ-পরিবারমধ্যেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দারুণ মনোবেদনায় দিন দিন তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্র উদয়সিংহের বয়ঃক্রম তখন ছয়বর্ষ মাত্র। উদয়সিংহকে চিরদিনের জন্য রাজোপাধি

হইতে বঞ্চিত রাখিবেন, এ অভিপ্রায়ে সর্দ্দারসামন্তগণ বনবীরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। উদয়সিংহের শৈশবাবস্থা; তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে কেবলমাত্র রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন, এই অভিপ্রায়েই পরামর্শ করিয়া তাঁহারা বনবীরের হস্তে মিবারের শাসনদণ্ড সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বনবীরের পরিবর্ত্তন—দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরভিসান্ধ

ইতিপূর্ব্বে বনবীর যে সমস্ত সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন, সিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেই সদ্‌গুণাবলী একবারে তিরোহিত হইল। সর্দ্দারসামন্তগণের যে অনুরোধ প্রথমে তিনি পালন করিতে সম্মত হন নাই, এখন তাহাই তিনি কল্যাণময় বরস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। চিরজীবনের জন্য চিতোররাজ্য যাহাতে তাঁহার হস্তগত থাকে, নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে যাহাতে তিনি আজীবন চিতোরের সুখসম্ভোগ করিতে পারেন, তাহার উপায় করাই, এখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। উদয়সিংহ জীবিত থাকিলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে না, পদচ্যুত বিক্রমাজিৎও জীবিত,—এই দুইটি বিষম কণ্টক জন্মের মত উন্মূলিত না হইলে তাঁহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অচিরে বিক্রমাজিৎ ও উদয়সিংহের প্রাণহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আকস্মিক বিপৎপাত—বিক্রমাজিৎ হত ধাত্রীর উপস্থিতবুদ্ধি

দিবাভাগ অতীত, সন্ধ্যা সমাগত। রজনীর ঘোর অন্ধকার সমস্ত জগৎ গ্রাস করিল। পানভোজন সমাপনান্তে উদয়সিংহের শিয়রে বসিয়া ধাত্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে; ইত্যবসরে অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়া ধাত্রীকে স্তম্ভিত করিল। এমন সময় অন্তঃপুরচারী ক্ষৌরকার

তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—বনবীর, রাজা বিক্রমাজিৎকে সংহার করিয়াছেন। মর্ম্মভেদী শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া ধাত্রীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে নিরতিশয় শঙ্কাও সেই উদ্বেলিত হৃদয়সাগর অধিকার করিল। বুদ্ধিমতী ধাত্রীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ ধারণা হইল, কেবলমাত্র বিক্রমাজিতের প্রাণবধ করিয়াই যে নররাক্ষস বনবীরের জিঘাংসাবৃত্তির শান্তি হইবে, ইহা অসম্ভব। সে অবিলম্বে উদয়সিংহের প্রাণসংহারের জন্যও উপস্থিত হইবে। রাজকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য ধাত্রীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কক্ষমধ্যে একটি প্রশস্ত পুষ্পকরণ্ডিকা ছিল,—ধাত্রী তন্মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে শয়ন করাইয়া তদুপরি কতকগুলি পুষ্পবিল্বপত্রাদি আচ্ছাদন করিল। ক্ষৌরকারের হস্তে করণ্ডিকাটি দিয়া বৃদ্ধা বলিল—'অবিলম্বে ইহা লইয়া দুর্গের বাহিরে যাও'।

নররাক্ষস বনবীর

ক্ষৌরকার তাহাই করিল। কিছুমাত্র তর্কবিতর্ক না করিয়া সে সেই মুহূর্ত্তে ধাত্রীর উপদেশ পালন করিল। ধাত্রী এদিকে রাজকুমারের শয্যায় আপনার নিদ্রিত শিশু-পুত্রটিকে স্থাপনপূর্ব্বক যেমন বহির্গমনের উদ্‌যোগ করিতেছে, অমনি ভীমবেশে ভীমমূর্ত্তি বনবীর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধাত্রীকে সম্মুখে দেখিবামাত্র তিনি উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধার প্রাণ উড়িয়া গেল—মুখে একটিমাত্রও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অঙ্গুলী-সঙ্কেতে রাজকুমারের শয্যা দেখাইয়া দিল।

অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অমানুষিক নৃশংসতার উদাহরণ

নৃশংস বনবীর তৎক্ষণাৎ শাণিত ছুরিকাঘাতে ধাত্রীনন্দনের বক্ষঃপ্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সম্মুখে প্রাণ-পুত্রের সুকোমল হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইল; বৃদ্ধা একবার প্রাণ খুলিয়া কান্দিতেও পাইল না! সন্তপ্ত হৃদয়ে

দুঃসহ বেদনা হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং উদয় সিংহের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ দুর্গের বাহিরে প্রস্থান করিল। বনবীরের নিষ্ঠুরাচরণে সংগ্রামসিংহের বংশলোপ হইল ভাবিয়া অন্তঃপুরললনাগণ আর্ত্তনাদে অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন।

ধাত্রী পান্না

ধাত্রীর এইরূপ অত্যদ্ভুত আত্মত্যাগ যে মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আপনার পুত্রকে কালমুখে অর্পণ করিয়া রাজকুমারের প্রাণরক্ষা করা, সামান্য পরিচারিকার সুলভ উচ্চ হৃদয়ের কর্ম্ম নহে—বস্তুতঃ ধাত্রী নীচকুলোদ্ভবা রমণী নহেন। রাজপুতকুলে তাঁহার জন্ম—নাম ধাত্রীপান্না।

সেখ সাদী

পারস্য ভাষায় সদ্ভাবপূর্ণ অনেকগুলি নীতিগর্ভ গ্রন্থ আছে; ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে সেখ সাদী নামক কবি-বিরচিত 'গোলেস্তাঁ' নামক গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সাদীর চমৎকার কবিতাবলী ইউরোপ ও আসিয়ার সকলদেশে বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়াছে। অহমদ্ আবুবেকর নামা কোন কাব্যানুরাগী ব্যক্তি, সাদীর পরলোকগমনের পর তাঁহার কবিতাবলী সংগৃহীত করিয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন।

সাদীরচিত 'গুলেস্তাঁ'

পারস্য দেশের অন্তর্গত শিরাজ নামক নগরে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সাদী জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহার প্রকৃত নাম মস্‌লঃ উদ্দীন্। কার্স প্রদেশের তাৎকালিক রাজা আতাবেগ সাদবিন্ জঙ্গী তাঁহার কবিতার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি 'সাদী' নাম প্রাপ্ত হন। সাদী 'সেখ' বর্ণাক্রান্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পূর্ণ নাম সেখ মস্‌লঃউদ্দীন্ সাদী। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন—বাল্যকাল হইতে তিনি অধ্যয়নের প্রতি অতিশয় যত্নশীল ছিলেন।

সেখ মস্‌লঃউদ্দীন সাদী

সাদী সর্ব্বপ্রথম বোগ্‌দাদ নগরস্থ এক সামান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। অল্পদিনমধ্যে তথাকার পাঠ সমাপন করিয়া তিনি গিনানীনামক এক পরম প্রাজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। গিনানী, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সাদীর প্রগাঢ় ও আন্তরিক শ্রদ্ধা অবলোকন করিয়া তাহাকে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদানদ্বারা তাহার চিত্তকুমুদ বিকশিত করিয়া তুলিলেন।

শিক্ষা

অধ্যয়ন সমাপনান্তে সাদী কিছুকাল গৃহে অতিবাহিত করিয়া, মক্কা-তীর্থে গমন করেন। তদনন্তর তিনি আরব, তুরস্ক, কাবুল, তাতার, মিসর, ভারতবর্ষ, প্রভৃতি দূরস্থ জনপদসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের আচার, ব্যবহার ও অবস্থাদর্শনে আপনাকে সম্যক্‌রূপ উন্নত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি "ভারতবর্ষে" চারিবার আসিয়াছিলেন এবং এতদ্দেশীয় হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

দেশভ্রমণ
হিন্দীভাষায় কবিতা

সাদীর জেরুজিলাম ভ্রমণকালে, ফরাসী জাতীয়েরা ক্রুশ-উদ্ধার-বিষয়ক ইতিহাসবিখ্যাত ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হইয়া সবলে মুসলমানশিবির আক্রমণ করিল এবং ব্যূহমধ্যে আসিয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার কিছুই স্থিরতা রহিল না। সাদী, এই সময় ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইয়া ত্রিপলি নগরে প্রেরিত হন এবং তথায় অন্যান্য ইহুদী বন্দিগণের সহিত মাটি কাটিতে নিযুক্ত হন। তিনি লিখিয়াছেন—"সেই নির্বন্ধে বন্দিগণের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ ও যন্ত্রণায় অবস্থান করিয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন করুণা প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে আমার যন্ত্রণা অপনোদনার্থ এক সুযোগ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে আলিপো নগরস্থ কোন ভদ্রলোকের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। বহুদিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু তিনি এক দিন আমাকে নিগড়বদ্ধ ও অতি বিমর্ষ দেখিয়া আমার সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক কারাবাসের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে কহিলে,

বন্দী

উদ্ধার

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার উদ্ধারের কোন সদুপায় হইয়াছে কি না?' আমি কহিলাম—'ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত আমি আর কোন উপায় দেখি না।' অনন্তর তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক ফ্রাঙ্কজাতীয়দিগের নিকট হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন এবং সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার ভবনে গমন করিলেন।

অত্যল্পকালমধ্যে, সাদীর ধর্ম্মপ্রাণতা এবং অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িলে, বিভিন্ন প্রদেশের নৃপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক রাজসভায় উপস্থিত হইবার জন্য তিনি নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। কিন্তু, ভজনের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান করিলেন। মূলতানের অধিপতি সুলতান মহম্মদ কয়াল, সাদী কবিকে এইরূপ তিন চারি বার আহ্বান করেন; কিন্তু তিনি তথায় উপস্থিত না হইয়া স্বহস্ত-লিখিত একখানি স্বরচিত 'গুলেস্তাঁ' পুস্তক প্রেরণ করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করেন।

নিমন্ত্রণ ও প্রত্যাখ্যান

একমাত্র ঈশ্বরনিষ্ঠ কবির জীবনচরিতে নানাবিধ ঘটনাসমাবেশের সম্ভাবনা নাই। সাদী, ত্রিংশৎবর্ষকাল বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অপর ত্রিংশৎবর্ষকাল দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল, একান্তে এক পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

শিক্ষা—ভ্রমণ ও সাধনা

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সাদী আসিয়ামাইনর, বারবেরী, আবিসিনিয়া, মিসর, সিরিয়া, পালেষ্টাইন, আরমাণিয়া, ইরাণ, তুরাণ, বসোরা, বোগ্দাদ, কাশগর ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বহুভাষাভিজ্ঞ ও শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট

বিবিধ ভাষাজ্ঞান সাদীর কবিতা

সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার কবিতা অষ্টাদশ ভাষার সমবায়ে রচিত। বিবিধ ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে সেরূপ রচনা নিতান্ত দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। তিনি লিখিয়াছেন—'আমি যে যে দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সকল দেশের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিগত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতাম না।' শৈশবাবধি কবিতা রচনা করিলেও, প্রাচীন কবিবৃন্দের ন্যায় সাদী প্রথমাবস্থায় খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। আতিবেগনামক কেবল কাব্যামোদী ভূপতি তাঁহার কবিতাকুসুমের মনোহর আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করেন এবং প্রবন্ধ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। সাদী অতি চমৎকার প্রাঞ্জল কবিতায় সেই প্রবন্ধ রচনা করিয়া রাজা ও সভাসদ্‌গণকে বিমোহিত করেন। তদবধি তাঁহার প্রশংসা ও খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

খ্যাতি ও প্রসার

ধর্ম্মপ্রাণতা, ঐহিক সুখে ঔদাস্য ও ঈশ্বরে প্রগাঢ়ভক্তির নিমিত্ত সাদী দেশমধ্যে যাদৃশ বরণীয় ও মান্য হইয়াছিলেন, কাব্যরচনার জন্য জীবিতকালে তাদৃশ সমাদৃত হন নাই। তিনি জীবনের শেষ চত্বারিংশৎ বৎসর ঈশ্বরারাধনায় এক পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করেন। এই সময় তিনি আহার সমাহরণজন্য কালক্ষেপ করিতেন না—তাঁহার ভক্তেরা যে খাদ্য তাঁহার জন্য আনিয়া দিত, তাহার কিয়দংশমাত্র আপনি গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ ভাগ ভিক্ষার্থীর জন্য গবাক্ষদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিতেন।

সাধনা ও বৈরাগ্য

সাদী অতিশয় সৌন্দর্য্য-প্রিয় ছিলেন। যে কোন পদার্থে সৌন্দর্য্য আছে, তিনি তদ্দর্শনে অশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তিনি কহিতেন—'বিশ্বপাতার অনুকম্পা, তাঁহার সৃষ্ট

সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা

সুন্দর পদার্থে বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হয়; অতএব সৌন্দর্য্যের দর্শনে ঈশ্বরের অনুকম্পার দর্শন হয়'।

সাদীর পরলোক—শব-মন্দির

কথিত আছে, ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে শিরাজ নগরে সাদী পরলোক গমন করেন। নগরপ্রান্তে এক অতিরম্য পর্ব্বতের উপত্য-কায় তাঁহার শব প্রোথিত করিয়া এক বিচিত্র শব-মন্দির বা প্রেতস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। শব-মন্দির-গাত্রে সাদী-রচিত কবিতাবলী খোদিত হইয়াছিল।

সাদীর বিবিধগুণাবলী

ছয়শত বর্ষাধিক কাল অতীত হইল সাদী পরলোক গমন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকুসুমাবলী উৎফুল্ল পদ্মের ন্যায় অদ্যাপি গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। সদ্বক্তৃতায় তিনি কি আপামরসাধারণ, কি পণ্ডিতমণ্ডলী—সকলকেই মোহিত করিতে পারিতেন। রম্য উপন্যাসকথনে তাঁহার মত পণ্ডিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। উপস্থিত বক্তৃতায় তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহার উদ্ভট কবিতানিচয় অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল। পরিহাসবিষয়েও সাদী অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সমকালীন কোন ব্যক্তিই তাঁহার প্রশ্না-বলীর প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিতে পারিত না।

রচিত গ্রন্থাবলী

সাদীর রচিত যে ২৪ খানি গ্রন্থ এখন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে 'গুলেস্তাঁ' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, বিষ্ণুশর্ম্মার সুবিখ্যাত 'হিতোপদেশের' ন্যায় গদ্যপদ্যে মিশ্রিত, এবং বিবিধ নীতিগর্ভ উপকথায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ, আদ্যোপান্ত যৎপরোনাস্তি কোমল ভাষায় রচিত। ইহাতে একটিও উৎকট শব্দের প্রয়োগ নাই। মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণে এই গ্রন্থ অদ্যাপি অপ্রতিদ্বন্দী রহিয়াছে। তাঁহার রচিত অপর গ্রন্থের নাম—'বোস্তান' বা সৌরভোদ্যান। এই গ্রন্থ নীতিজনক কবিতায় পরিপূর্ণ—ইহাতে কোন উপন্যাস নাই।

অক্ষয়কুমার দত্তের কথা

লেখকের আত্মকথা

আমাদের আদরের 'চারুপাঠ,' 'ধর্ম্মনীতি' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রণেতা অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর অষ্টাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। ১২৯৩ সালের ঠমাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চরম-পত্রের অভিপ্রায়মতে আমি জনৈক 'একৃজিকিউটার'স্বরূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছিলাম। অধুনা তাঁহার একমাত্র পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিষয়াভিজ্ঞ হওয়ায়, তাঁহার উপর ভার দিয়া আমি অবসরগ্রহণ করিয়াছি। এই সময়ে তাঁহার সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অক্ষয়কুমারের সহিত যে সকল লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁহাদের অনেকেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমি বয়সে ও মমতায় তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিলাম, আমিই বার্দ্ধক্যে উপনীত। বোধ হয়, আর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার অন্তর্জীবনের কথা বলিবার আর কেহই থাকিবে না।

বালীর বাটীতে প্রথম দর্শন

১২৮০ সালে চৈত্রমাসে বালীর গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আমি প্রথম অক্ষয়কুমারকে দর্শন করি। তিনি তখন পীড়িত অবস্থায়। বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া ও সংসারে বিরক্ত হইয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বিরহিত-ভাবে বালীতে বাস করিতেছিলেন। তখন বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পত্র, ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ তাঁহার পরিবার। গুরুতর চিন্তা করিতে তিনি তখন অসমর্থ; গুরুতর কেন, সামান্য চিন্তা করিতেও তিনি অসমর্থ। সাংসারিক বা বৈষয়িক কোন বিষয়ের চিন্তা আবশ্যক হইলে,—কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে, তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইতে হইত।

আমার শ্বশুর, ৺স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের জামাতা, ৺শ্রীনাথ ঘোষ ও ৺রাজার দৌহিত্র ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমারের পরম বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁহাদের নিকট তিনি উচ্চশ্রেণীর গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের বৈষয়িক ও

সাংসারিক কার্য্যের ভার

সাংসারিক কার্য্যের ভার, প্রায়ই এই দুইজনের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের অভিপ্রায়মত সকল কার্য্য হইত।

অক্ষয়কুমার আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; আমারও তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহ হইয়াছিল। বাল্যকাল

বালীর শোভনোদ্যান

হইতে কেবল গ্রন্থদ্বারা পরিচিত মহাত্মাকে দেখিতে কাহার না লালসা হয়? প্রাতঃকালে আমার শ্বশুরের সহিত বালীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর বাটী; স্থানটিকে তিনি শোভনোদ্যান বলিতেন, কিন্তু ঋষিকুটীর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে অট্টালিকাকে "কুটীর" বলিয়া নিজের নিরভিমান দেখান; অক্ষয়বাবু কুটীরকে শোভনোদ্যান বলিতেন; তিনি "কুটীর"কেই শোভনোদ্যান বলিয়া নিজের সন্তুষ্টচিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে পূতসলিলা ভাগীরথী; ভবন বিবিধলতাবৃক্ষ-সমন্বিত, সংসারবিরত ব্যক্তির থাকিবার স্থান। দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একটি আম্রবৃক্ষ; মাধবীলতাসমন্বিত সহকারের পরিবর্ত্তে তাহা কণ্টকময় লতার রক্তবর্ণ পুষ্পসমন্বিত। প্রথমেই বৃক্ষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দক্ষিণে অনতিদূরে আর একটি রক্তবর্ণ পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষ, ইহাও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অন্যান্য বিবিধ আকারের ও বিবিধ চিত্রের বৃক্ষলতাদি দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। দক্ষিণের বৃক্ষটির নাম "পান্‌সেটিয়া রিজিয়া।" এখন কলিকাতার রাস্তায় অনেক "পান্‌সেটিয়া রিজিয়া" দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতল ইষ্টকালয়ের দক্ষিণে অনেক গোলাপের গাছ, মধ্যস্থলে একটি সুন্দর "অরেকেরিয়া এক্‌সেল্‌সা"। কতরকমে অক্ষয়কুটীর সুশোভিত! তাঁহার পরিবারবর্গের সংখ্যা, আকার ও প্রকৃতি অগণ্য ছিল।

প্রথম সাক্ষাৎ—উদ্ভিজ্জীবনের বৈচিত্র্য-দর্শন

তখন অক্ষয়কুমার একটি ছোট কাচের যন্ত্র হস্তে লইয়া কি পাতা দেখিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি সাদরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস বাবা, এখনও উত্তাপ বেশী হয় নাই; তোমাকে উদ্ভিজ্জীবনের বৈচিত্র্য দেখাই।" বোধ হইল যেন তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার নিকটস্থ পরিজনের সহিতও আমার সম্প্রীতি হয়,—আমি তাহাদের নাম ও প্রকৃতি বুঝিয়া লই। আমি তখনও উদ্ভিদ্-বিদ্যার নিকটেও যাই নাই। উদ্ভিজ্জীবনের কিছু জানিতাম না। বৃক্ষলতাদি ভালবাসিতাম বটে; কিন্তু অন্য চিন্তায়, অন্য পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম; তখনও উদ্ভিজ্জগতের কথা একবারও চিন্তা করি নাই। অক্ষয়কুমার সেই দিন প্রথম উদ্ভিদ্বিদ্যার আনন্দে আমাকে দীক্ষা দিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেক বৃক্ষলতাদি ও তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখাইলেন; তৎকালে তাহাদের 'লিনিয়ানরীতি'র নামও বলিলেন। তিনি শিবপুরের "বোটানিকেল গার্ডেনে" প্রায়ই যাইতেন, নূতন রকমের উদ্ভিদ্ দেখিলেই তাহা আনাইয়া আদরের সহিত নিজের সঙ্গী করিতেন।

'ভাষবিজ্ঞান' বিষয়ক মত

অক্ষয়কুমারের যত্নে ও স্নেহে আমি সিক্ত হইলাম। অনতিপূর্ব্বেই আমি "মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিনে" "বঙ্গভাষার ভাষা-বিজ্ঞান" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তিনি তাহা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

দ্বিতলে উঠিয়া প্রথমেই বিবিধ শঙ্খাদি ও প্রস্তরাদি দেখিলাম।

দ্বিতল কক্ষে

প্রত্যহ পাঁচসাত রকমের ঔষধ সেবন ও দুই তিন রকম তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা দেখিলাম। পরে গঙ্গা-স্নান করিয়া আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। তিনিও ঘরের ভিতরে স্নান কয়িয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, আমাকে ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শঙ্খবিদ্যা

ভূবিদ্যা প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি

প্রভৃতিতে দীক্ষা দিবার সময় আসিল। আমাকে অনেকগুলি অনেক রকমের প্রতিকৃতি দেখাইলেন ও যাহাতে আমার তত্ত্ববিদ্যায় আসক্তি হয়, তাহার চেষ্টা করিলেন। আমি অনেকই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এতটুকু বুঝিলাম যে, অক্ষয়কুমার এই সকল বিদ্যায়ও সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়াছেন। পরে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, তিনি প্রকৃতই বিজ্ঞানসেবক ছিলেন।

বেলা পড়িলেই তিনি আমাকে লইয়া "অর্কিড্ হাউসে" প্রবেশ

অর্কিড্ হাউস' বিদায়

করিলেন। বিবিধপ্রকার অর্কিড্, ফার্ণ, মস্ দেখাইলেন, তাহাদের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য্য দেখাইলেন এবং নাম বলিয়া দিলেন। হাতে কাচযন্ত্র, আমাকেও তদ্দ্বারা দেখিতে বলিলেন। নিকটে একটি শাদা ফুলের গাছ ছিল, তাহা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া, তাহার নাম বলিলেন এবং অন্যান্য অনেক বৃক্ষলতাদির গুণের কথা বলিলেন। পরে বেলা অবসন্ন হইয়া আসিলে আমার শ্বশুরও আমাকে বিদায় দিলেন, এবং আমি যেন সময় পাইলেই তাঁহাকে দেখিতে যাই, তজ্জন্য আমার শ্বশুরকে অনুরোধ করিলেন। সেই দিন হইতেই আমি অক্ষয়কুমারের স্নেহের পাত্র হইলাম এবং আমারও অক্ষয়কুমারকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। অক্ষয়কুমারের বসিবার স্থানে ও তাঁহার শয়নগৃহে ডারউইন্ ও নিউটনের ছবি, আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির নক্সা, মনুষ্য ও কয়েকটি পশুপঞ্জরের প্রতিকৃতি।

অধ্যয়নকক্ষের সাজ-সজ্জা

তদবধি তাঁহার পরিচারক শ্রীরাম প্রায়ই আমার নিকট আসিত। শ্রীরাম বাঙ্গালাস্কুলে পণ্ডিত ছিল। সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া অক্ষয়কুমারের নিকট নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার লেখাপড়ারও সমস্ত কার্য্য করিত। কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাম ছোট ছোট টবে কতকগুলি গাছের চারা ও কলম আমাকে আনিয়া দিল। আমি যে সে রকমের পুষ্প প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে দেখিয়াছিলাম, তাহা অক্ষয়কুমার বুঝিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার নিকট কলম বাঁধাইয়া ও চারা প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম আমাকে বলিল যে, অক্ষয়বাবু আবার আমাকে একদিন বালীর বাটীতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। "চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া," আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই বালীতে উপস্থিত হইলাম। যে সময়ে উপস্থিত হইলাম, তখন অক্ষয়কুমার "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের" উপক্রমণিকা-অংশ শ্রীরামকে দিয়া লেখাইতেছিলেন। কোন দিন পাঁচ ছত্র, কোন দিন দশ ছত্র মুখে মুখে বলিতেন ও শ্রীরাম লিখিয়া লইত। তাঁহার নিজে লিখিবার সামর্থ্যের অভাব হইয়াছিল ; অতিকষ্টে আট দশ ছত্র লিখিয়াই ক্লান্ত হইতেন ও পুনর্ব্বার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্টবোধ হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা লেখাইতে পারিয়া-

পরিচারক শ্রীরাম

পুনরাগমন

উপাসকসম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা

ছিলেন ; এই ২৮২ পৃষ্ঠা অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তি। উপক্রমণিকার শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন —

"এবার এই পর্য্যন্ত, আর চলিয়া উঠিতেছে না ....যদি কখন এই উপাসকসম্প্রদায়ের তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ইতিবৃত্ত বিনিবেশিত হইবে। এখন শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এটি একটি দুরাশা মাত্র ; কিন্তু আশায় জগতের জীবন, আশায় ইহলোক ও আকাশপথ অতিক্রম করিয়া উড্ডীয়মান হয়, শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা আর কি বলিব। না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থশ্রবণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যে আমি সমর্থ নহি, ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রে মানসিক কষ্ট হইয়া থাকে .... অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাবসংবলিত চিন্তাপ্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে স্পষ্টই অনুভব করিতেছি : তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানাচেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি ; কিছুতেই সে চিন্তাস্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদয় ও যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তকমধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি, অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রাকাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়াও কতবার কত বিষয় লিখাইতে হইয়াছে। ....এইরূপ করিয়া কখনও ৫।৭ পংক্তি, কখনও ২।৪টি বা ২।১টি শব্দ মাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়।"

যে মহাত্মা এরূপ অবস্থায় এরূপ অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কি অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার কি অসাধারণ উৎসাহ, কি অসাধারণ অধ্যবসায়! এইরূপে মহাত্মা অক্ষয়কুমার, ১২৮৯ সালের ৮ই চৈত্র ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত করিবার আর অবকাশ হয় নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে আমি অনেকবার তাঁহার নিকটে গিয়াছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাঁহার চরম গ্রন্থের কোন অংশ লিখনের ভার পড়ে নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কালাবশিষ্ট দেহের উত্তমভাগে বুদ্ধির, জ্ঞানের, চিন্তার চিহ্ন ছিল। চিন্তাতে অসমর্থ অথচ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন!

'উপাসকসম্প্রদায়ের' দ্বিতীয়ভাগ

আমাকে দেখিলেই যেন তাঁহার বাৎসল্য ভাবের আবির্ভাব হইত, গুরুতর চিন্তা অন্তর্হিত হইত। তিনি সকল সময়েই আমাকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি তাঁহার আদরের শাস্ত্র-সমূহে দীক্ষিত করিবার জন্য যত্নবান্ হইতেন। যতবার গিয়াছি, ঐ সকল শাস্ত্রের কথা। আমিও তাঁহার শিষ্য হইয়া বিজ্ঞানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম! কিন্তু বিজ্ঞান ভালবাসিতে শিখিয়াছি মাত্র; অক্ষয়কুমারের শিষ্য হইতে পারি নাই।

অক্ষয়কুমারের স্নেহ

১২৯১ সালের শীতকালে, বোধ হয় মাঘমাসে, শ্রীরাম আসিয়া অক্ষয়কুমারের উইলের মুসাবিদা আমার হস্তে দিল। তাঁহার ইচ্ছা যে, আমি তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিই। অনেকেই অক্ষয়কুমারের উইল বা চরমপত্রের নকল দেখিয়া থাকিবেন; অন্ততঃ অনেকেই শুনিয়াছেন। বোধ হয়, এত-দিনের কথা অনেকেরই মনে নাই; তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও কন্যা বর্ত্তমান, অথচ তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির তিন সপ্তমাংশ বিজ্ঞানালোচনা, বিদ্যোৎ-

'উইল'-পত্র

সাহবর্দ্ধন, দরিদ্র-দুঃখবিমোচন ও বালকগণের শরীরপুষ্টির জন্য অর্পণ করিয়া যান।

কিছুদিন পরে অক্ষয়কুমার আমাকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখিলাম, তাঁহার শরীর আরও শীর্ণ হইয়াছে; বোধ হইল, জীর্ণ শরীর আর বহুদিন তিনি বহন করিতে পারিবেন না। তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল; দেখিয়া তাহার একটি তালিকা করিতে বলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই পুস্তকগুলি বিশবৎসর আমার নিকটে থাকে ও সাধারণে পড়িতে পারে। সেই দিন অনেকগুলি পুস্তক আমি খুলিয়া দেখিলাম ও দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তিনি সকলগুলি পড়িয়াছিলেন, অথবা অপর দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। পেনি সাইক্লোপিডিয়ার ধারে ধারে অনেকস্থলেই বাঙ্গালায় তাঁহার অভিপ্রায় লেখা আছে। "এশিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণাল্" প্রায় সমস্তই ছিল এবং পাশে পাশে বাঙ্গালায় তাঁহার টিপ্পনী। গণিতশাস্ত্রের অনেক পুস্তক ছিল। জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান, প্রায় সকল প্রকার বিজ্ঞানেরই পুস্তক ছিল ও সকল পুস্তকই তিনি পড়িয়াছিলেন, সকল পুস্তকেই তাঁহার টিপ্পনী। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮ বৎসর পুস্তকগুলি আমার নিকটে ছিল, অনেক সময় আমি তাহার অনেকগুলি দেখিয়াছি: তাঁহার অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। অনেকে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাগারের শোভা বর্দ্ধিত করেন, অনেকে পরের উপকারার্থ বিবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন; অক্ষয়কুমার তাঁহার সংগৃহীত পুস্তক সমস্তই পড়িতেন বা পাঠ করাইয়া শুনিতেন এবং তাহার ভাব পরিগ্রহ করিতেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। উপাসকসম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা পড়িলে তাঁহার বিদ্যানুশীলনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পুস্তকাগার—অধ্যয়নের নিদর্শন

শেষ সাক্ষাৎ—
সংকারের ব্যবস্থা

তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ মাস পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি আরও শীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেক কথার পর আমাকে বলিলেন,—"বাবা, তুমি উইল অনুসারে আমার সম্পত্তির পর্য্যালোচনা করিবে, কিন্তু আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে একটি কথা আছে; আমার মৃত্যুসংবাদ পাইলেই তুমি এখানে আসিবে; যতক্ষণ তুমি না আসিবে, আমার সংকার হইবে না। ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সংকারের আদেশ দিবে, কিন্তু মৃত্যুর পর অন্ততঃ ছয়ঘণ্টা সংকার হইবে না।" এই কথার উদ্দেশ্য কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না, আমিও তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম।
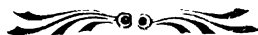
মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাল্যশিক্ষা

সমপাঠীর প্রতি সহানুভূতি

বাল্যে মধুসূদন অতি অমায়িক ছিলেন। ধনের ও সম্ভ্রমের গর্ব্ব তাঁহার প্রকৃতিতে কখনই ছিল না। যখন তিনি হিন্দু কলেজে পাঠ করিতেন, তখন কলেজের অনেক ছাত্র অপেক্ষাকৃত নীচজাতীয় বালকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত। কিন্তু মধুসূদন, কখনও কাহারও সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। পুরস্কারের জন্য হউক বা অন্য কোন প্রয়োজনেই হউক তাহারা তাঁহাকেই আসিয়া অনুরোধ জানাইত। প্রতিবাসিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে কোন দুঃখ জানাইলে তিনি সাধ্যানুসারে তাহা মোচন করিতে ক্রটী করিতেন না। তিনি পিতামাতার আদরের ধন ছিলেন; সুতরাং তাঁহার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিত না। পূর্ণ বয়সে নানা বিষয়ে মধুসূদনের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; কিন্তু শৈশবার্জ্জিত অমায়িকতা, সহৃদয়তা এবং পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

শৈশবে ভবিষ্যজীবনের পূর্ব্বাভাস

মধুসূদনের সাত বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি খিদিরপুরে একটি বাটী ক্রয় করিয়া সেখানে অবস্থান করেন। আর মধুসূদনের জননী পুত্রকে লইয়া সাগরদাঁড়ীর বাটীতে থাকিতেন। মধুসূদন মাতার নিকট থাকিয়া গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই শৈশবে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বলক্ষণ সূচিত

হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, বিজ্ঞানপ্রিয় তীক্ষ্ণধী অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠশালায় ভূমিপরিমাণ শিখিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"পৃথিবী কত বড়? পৃথিবীর কি পরিমাণ করা যায় না?" অসাধারণ প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বর্ণশিক্ষার দিনেই সমস্ত বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের ন্যায় বালক মধুসূদনেও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের দুই একটি পূর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। শিশু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় যদিও তিনি তিনবৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করেন নাই, তথাপি অন্যান্য অনেক বিষয়ে আপনার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন।

অধ্যয়নাসক্তি ও কাব্যানুরাগই মধুসূদনের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। বাল্যকাল হইতেই এই দুইটি গুণ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ধনিসন্তানদিগের প্রায়ই লেখাপড়ায় অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। তাহার উপর যে সকল বালক গুরুজনদিগের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হয়, তাহারা বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে একবারেই অমনোযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু মধুসূদন ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান এবং গুরুজনদিগের অত্যধিক আদরের পাত্র হইয়াও কখনও লেখাপড়ায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই।

অধ্যয়নাসক্তি ও কাব্যানুরাগ

বর্ত্তমান সময়ের পাঠশালাসমূহ, পূর্ব্বকালীন পাঠশালা হইতে বিভিন্ন। সে সময়কার পাঠশালাসমূহের কথা শ্রবণ করিলে অনেকেরই হৃৎকম্প জন্মিবে। বেণুদণ্ড ও বেত্রখণ্ড তখন ছাত্রপৃষ্ঠে অজস্রধারে বর্ষিত হইত। তস্করকেও যে দণ্ড দেওয়া এখন লোকে অনুচিত বিবেচনা করেন, নিরীহ বালকদিগকেও তখনকার গুরু মহাশয়েরা সে দণ্ড

সেকালের পাঠশালা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা

দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। কিন্তু এ অবস্থায়ও মধুসূদন পাঠশালায় যাইবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এবং সাধ্যানুসারে কখনও পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে ত্রুটি করিতেন না। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি হিন্দুকলেজে সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

উচ্চাভিলাষ—জননী ও জনককর্ত্তৃক পরিপুষ্ট

উচ্চাভিলাষই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন বিষয়েই মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয় না। এই মহত্ত্ববীজ বাল্য হইতেই মধুসূদনের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ তাঁহার জননীর প্রদত্ত উৎসাহবাক্যে এবং তাঁহার পিতার আদর্শে সম্যক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্তপরিবারের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকুলের সম্ভ্রমে এবং কৃতী স্বামীর ও প্রতিভাবান্ পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ নারীগণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে উচ্চাভিলাষ মনুষ্যের হৃদয়ে স্বভাবতঃ উত্থিত হইয়া থাকে, জাহ্নবীদাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের পিতাও তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবহারাজীব ছিলেন। পিতার সম্ভ্রম ও কৃতিত্বে বালক মধুসূদন মহত্ত্ব অর্জ্জনে প্রণোদিত হইয়াছিল। সেইজন্য লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন দিন তাড়না সহ্য করিতে হয় নাই। নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগগুণেই তিনি প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ

হইয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজে থাকিতে তিনি যেমন যত্ন সহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, পরবর্ত্তী জীবনেও কখন তাহার ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

কাব্যানুরাগ জননী হইতে প্রাপ্ত

অন্যান্য গুণাবলীর ন্যায় মাইকেলের কাব্যানুরাগও তাঁহার জননী-প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবী দাসী, তৎকালেও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি 'রামায়ণ' 'মহাভারত' এবং 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেকাংশ তিনি অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন আট দশ বৎসর বয়সের সময় মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্তানুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। মনুষ্য মাতৃস্তন্য পানের সহিত যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে একথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু-ভাষায় এবং বহুগ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও মাতৃ-প্রদত্ত শিক্ষার ফলে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' পাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। যে মহাগ্রন্থদ্বয় শতশত বৎসরাবধি হিন্দু নরনারীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে এবং সহস্র সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপনাপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যে পুনঃপুনঃ 'রামায়ণ' ও 'মহা-

ভারত' পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার কবিশক্তিবিকাশের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি হইতে শিক্ষা-লাভ

প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা উপদেষ্টার উপদেশ হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিত্য নবীন মুখশ্রী যে, কত অপ্রেমিককে প্রেমিক, কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই জন্য মধুসূদনের শৈশবের অন্যান্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমির কথার উল্লেখ আবশ্যক। প্রকৃতির অতি সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্যশোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহার কোনটির সেখানে অভাব ছিল না।

পলিনেসিয়া

প্রশান্ত সাগরবক্ষে যে দ্বীপপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম পলিনেসিয়া। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে কাপ্তেন কুক্ এই দ্বীপপুঞ্জের বিবরণ-প্রকাশিত করেন। তদবধি সকলেই পলিনেসিয়াবাসীদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার প্রভৃতি বিষয় অবগত হইতেই সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত। অধুনা ধর্ম্মপ্রচারকগণের অনুগ্রহে ইহাদের রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, বিধানসংহিতা, ভাষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই সবিশেষ বিদিত হওয়া গিয়াছে।

পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ

পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তি কাহিনী অতি অদ্ভুত। ভাবিতে ভাবিতে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। জগদীশ্বরের অনন্তকার্য্য পর্য্যালোচনা করা কাহার সাধ্য? কিরূপ উপাদানে কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা মনুষ্যের অসাধ্য। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রবালকীট সমুদয় সমুদ্রগর্ভ হইতে পলিনেসিয়ার অধিকাংশ দ্বীপপুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। কিরূপে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দ্বারা এরূপ অদ্ভুত কীর্ত্তি সম্পাদিত হইল, তাহা বুদ্ধির অগম্য। এই প্রবাল কীট সমুদয় প্রশান্ত মহাসাগরের আকার একবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে নীলবর্ণ লবণাম্বুরাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, এক্ষণ সেখানে শত শত দ্বীপ, সুস্বাদফলশালী তরুরাশিতে সুশোভিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে।

বিচিত্র উৎপত্তি-কাহিনী

প্রবালকীট

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপগুলির অর্দ্ধক্রোশ দূরে প্রাবল কীটনির্ম্মিত এক একটি করিয়া চক্রাকার প্রাচীর আছে। ভীষণ পর্ব্বতাকার সমুদ্রতরঙ্গনিচয় এই প্রাচীরগাত্রে আঘাত করিয়া আপনাদের প্রবল বেগ নিঃশেষিত করিয়া ফেলে—দ্বীপগাত্রের অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। এই প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে এক একটি দ্বার আছে—অর্ণবপোত সকল সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দ্বীপপ্রান্তে অবস্থিতি করে।

চক্রাকার প্রাচীর

সমুদ্র হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে অতি রমণীয় বোধ হয়। হরিদ্বর্ণ তরুশাখা ও লতাসমুদয় মনোহর ফলপুষ্প বিভূষিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে আস্ফালিত হইতেছে, পুরেট বৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখাসমুদয়ের নিম্নভাগে শান্তিপূর্ণ চিত্তবিমোহন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরসমুদয় শোভা পাইতেছে—উপত্যকাভাগে স্বর্ণবর্ণ শস্যরাশি মন্দ মন্দ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে এবং তরঙ্গিণীসমুদয় ঘোররবে পর্ব্বতগুহা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্রাকারে উর্ব্বর ক্ষেত্রতল আলিঙ্গন করিয়া স্মিতমুখে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে—এই সকল দেখিয়া কাহার হৃদয় অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে উচ্ছলিত না হয়? সমুদ্রমধ্য হইতে যখন মেঘমালাসদৃশ পর্ব্বতশ্রেণী পরিলক্ষিত হয়, তখন আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তীরে পদার্পণ করিলে এই দ্বীপসকলকে প্রকৃতির বিহারোদ্যান বলিয়া মনে হয়। এখানকার যাবতীয় পদার্থ উৎসববেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রই শান্তি বিস্তার করিতেছে।

প্রাকৃতিক শোভা

এই দ্বীপপুঞ্জের ভূমি যেমন উর্ব্বরা, জলবায়ু তেমনই উৎকৃষ্ট। এখানে এরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল-মূল লক্ষিত হয়, যাহার নামও কেহ কখন শ্রবণ করে নাই। এখানে ব্রেড্‌ফ্রুট্‌ নামক, কাঁঠালের ন্যায় এক

আশ্চর্য্য ফল ও বৃক্ষাদি

প্রকার ফল আছে, তাহা এই দ্বীপবাসীর প্রধান ভক্ষ্যদ্রব্য। এই দীর্ঘকায় তরু বহুস্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান থাকে। ইহাদের পত্রগুলি দন্তুর এবং গোল সতর ইঞ্চি লম্বা। বৎসরে তিন চারি বার ফল হয়। পক্কফল দেখিতে পীতবর্ণ, -ব্যাস প্রায় ছয়ইঞ্চি। এই বৃক্ষের তক্তায় গৃহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী নির্ম্মিত হয়,—বল্কলে তদ্দেশবাসিগণের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জেও আলু, এরাকট, নারিকেল, কদলী ও ইক্ষু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের অধিবাসিগণ ইক্ষু হইতে কিরূপে চিনি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানিত না—আঙ্গুর, কমলালেবু তেঁতুল প্রভৃতি তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এক্ষণ তাহারা চিনি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে—আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদ ফলের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া এই সকল ফল যথেষ্টপরিমাণে উৎপাদন করিতেছে।

ঈশ্বর চিন্তা।

এখানে মানুষের সর্ব্বপ্রকার ভোগদ্রব্য রাশীকৃত রহিয়াছে। এই দ্বীপের বন্যপশুসদৃশ অধিবাসিগণ মধুময় ফল ভক্ষণ করিত, সুশীতল বারি পান করিত, মনোহর উদ্যানে ভ্রমণ করিত, নানাজাতি বিহঙ্গমের মধুর গান শ্রবণ করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিত। কিন্তু কে কি অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে এই সমুদয় রমণীয় পদার্থ উপভোগ করিতে দিয়াছেন, তাহা তাহারা একবারমাত্রও চিন্তা করিত না। আহার ও নিদ্রা প্রভৃতি পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত—কিরূপে মনুষ্যনামের সার্থকতা করিতে হয়, তাহার বিন্দুবিসর্গও তাহারা অবগত ছিল না। এখন তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে—তাহারা সকল সামগ্রীই এখন নূতন চক্ষে অবলোকন করিতে শিখিয়াছে?

এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ, দীর্ঘ বা মাংসল না হইলেও ইহাদের

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন অতি সুন্দর। ইহারা অতিশয় কর্ম্মক্ষম। ইহারা বলে যে, ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব্বে তথায় কদাকার বা রুগ্‌ণ ব্যক্তি ছিল না। ইহাদের ললাট প্রশস্ত, নেত্র দীর্ঘ, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ; নাসিকা তিলপুষ্পসদৃশ; ওষ্ঠ মাংসল, দন্ত অতিক্ষুদ্র ও কর্ণ দীর্ঘ। ইহাদের কেশ অতি কোমল ও চক্রাকার—গাত্রের বর্ণ পিঙ্গল। নারীগণ পুরুষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় নারীদেহ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

শারীরিক গঠন

ইহারা ধীরপ্রকৃতি, প্রসন্নস্বভাব ও আতিথেয়ী। ইহারা অধিক পরিশ্রম করে না এবং অধিক ভক্ষণও করে না। ইহারা সায়ংকালে নিদ্রাগত হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে।

স্বভাব

এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসি-সংখ্যা অধিক নহে। সমুদয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ একত্র করিলে পঞ্চাশ সহস্রের অধিক হইবে না।

অধিবাসীর সংখ্যা

১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজদের জাহাজ প্রথমে এই দ্বীপের উপকূল স্পর্শ করে, তখন অধিবাসিগণ এই সমুদ্রপোত ও কামান দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাসমান দ্রব্যগুলি এক একটি দ্বীপ—তথায় দেবতারা বাস করেন এবং তাহাদের আজ্ঞায় বিদ্যুৎস্ফুরণ ও বজ্র-নির্ঘোষ হয়। অধিবাসিগণ, প্রথম দর্শনে ইংরাজদিগকে দেবতাজ্ঞানে আদর, ভয় ও বিস্ময়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

অধিবাসিগণের ভ্রম ও ইংরাজ-অভ্যর্থনা

জাহাঙ্গীরের তুলাদান

রাজধানীতে আজ মহাসমারোহ। রাজপ্রাসাদে সমারোহের স্রোতোবেগ পূর্ণোচ্ছ্বাসে বহিতেছে। আজ বাদসাহ তুলাদণ্ডে উত্তোলিত হইবেন। স্বর্ণপ্রসবিনী রত্নগর্ভা ভারতে আজ মোগল বাদসাহের মহা আনন্দের দিন। দীন দরিদ্র সকলেই আজ আনন্দোৎফুল্ল—দরিদ্র অর্থলাভ করিবে, বাদসাহ স্বহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া আজ তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন।

বাদসাহের জন্মতিথি

আমীর ওমরাহ মহলে বড় ধূম—যাহার যেখানে যা কিছু বহুমূল্য রত্নভূষিত বেশভূষা ছিল, তাহা সকলেই পরিধান করিয়াছেন—মস্তকে মণিখচিত শিরস্ত্রাণ, কোষে দ্যুতিময় তরবারি, আপাদমস্তক বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত। প্রাসাদের তোরণরাজি নানাবিধ মনোমোহকর পুষ্পপতাকাসজ্জায় বিভূষিত হইয়াছে, রক্তচিহ্নিত মোগল-পতাকা সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদোপরি বসিয়া প্রফুল্লচিত্তে বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। স্থানে স্থানে নহবৎ বাজিতেছে। রাজপুরী সহস্র সহস্র গবাক্ষরূপ নেত্রোন্মীলন করিয়া এই অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে।

অপূর্ব্ব শোভা

প্রাসাদমধ্যেই এক সুবৃহৎ শ্যামল উদ্যানে তুলাদণ্ড সংস্থাপিত হইয়াছে। বাগানের চারিদিকে সুগভীর পরিখার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ জলে তটস্থ বৃক্ষলতাদির মনোহর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে মর্ম্মরপ্রস্তর-রচিত এক অত্যুন্নত মঞ্চের উপর তুলাদণ্ড ঝুলিতেছে। তুলাদণ্ডের উপরে মণিখচিত দ্যুতিময় চন্দ্রাতপ, তাহার উপরে

তুলা-দণ্ডের সংস্থান-ক্ষেত্র

সুনীল অনন্তবিস্তৃত আকাশ। তিনটি স্বর্ণময় স্তম্ভের শিখরদেশ বক্রভাবে সম্মিলিত করিয়া সেই সন্ধিস্থল হইতে সুবৃহৎ তুলাদণ্ড বিলম্বিত করা হইয়াছে। তুলাদণ্ডে বাদসাহের উপবেশনস্থলটি চতুষ্কোণ এবং সুবর্ণ-পাতে মণ্ডিত ও নানাবিধ মণিমুক্তা খচিত।

পূর্ণবেশে বাদসাহ

তুলাদণ্ডের সম্মুখে সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে বসিবার সুবিখ্যাত গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে—আমীর ওমরাহ ও সম্ভ্রান্তগণ সেই গালিচার উপরে বাদসাহের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সহসা বাদসাহ অন্তঃপুর হইতে সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আপাদমস্তক রত্নালঙ্কারে ও রত্নভূষায় বিভূষিত। উষ্ণীষের উপর সুবৃহৎ কপোতাণ্ডধাকার বহুমূল্য উজ্জ্বল মণি জ্বলিতেছে। কণ্ঠে মণিহার দোদুল্যমান। হস্তে দ্যুতিমান্ হীরকবলয়, কোষে মণিখচিত উজ্জ্বল তরবারি, কটীদেশে স্বর্ণময় হীরকখচিত শৃঙ্খল ঝুলিতেছে। বস্তুতঃ রত্নপ্রসবিনী ভারতের অধীশ্বরের অদ্যকার বেশভূষা দেখিলে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।

তুলা-মান

বাদসাহ উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরে তুলার কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি তুলাদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া প্রথম ছয় বার রৌপ্যমুদ্রার ভারে তৌলিত হইলেন। টাকার তোড়া তুলাদণ্ডে রাখিয়া প্রত্যেক বারে তাঁহার ভারের সমতুল করা হইল। এই প্রকারে তৌলিত মুদ্রাসংখ্যা নয় সহস্র। দ্বিতীয় বারে নানাবিধ মণিমুক্তা ও স্বর্ণভারে তাঁহার ভার স্থিরীকৃত হইল। স্তূপীকৃত রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্বে এইগুলিও রাখিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কারুকার্য্যময় জরীর সূক্ষ্মবস্ত্র উৎকৃষ্ট ঢাকাই মসলিন ও নানাবিধ কার্পাস-নির্ম্মিত ও কৌষেয় দেশীয় বস্ত্রে তাঁহার পরিমাণ স্থিরীকৃত হইল। তৃতীয়

বারে চন্দন, মৃগনাভি, আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও গোধূম যব প্রভৃতি শস্যে তৌলিত হইলেন।

তুলা-দান

এই সমস্ত অর্থ ও মণিমুক্তাদি বিতরণের জন্য। উল্লিখিত নয় সহস্র মুদ্রা বাদসাহের স্বহস্তে বিতরণের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইল। রাত্রিকালে নির্জ্জনে বসিয়া যে কোন দরিদ্রকে ইচ্ছামত ডাকিয়া তিনি স্বহস্তে এই মুদ্রাগুলি বিতরণ করিতেন। কেবল মুদ্রা পাইয়া যে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত এমন নহে; তিনি নানাবিধ মধুর আলাপে তাহাদিগকে নানা প্রকারে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিতেন।

জাহ্নবীর তটশোভা

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা, এমন আর কোথায় আছে! গাছ, পালা, ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুল কুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম

গঙ্গা-তট

ঘুমাইতেছে। তাহার আর একপাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙ্গা ঘাটগুলির কি শোভা! মনুষ্যেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে, তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছ-পালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথ গাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছ-পালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গিয়াছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধব্‌ধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙ্গাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে সকল ছেলে-মেয়েরা নাইতে বা জল লইতে আসে, তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতিনী, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল, তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারিজন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই।

গঙ্গার ঘাট

গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেব-প্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুট-বিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ-ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে।

দেবালয় ও লোকালয়

হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠিবাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলেদের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটী ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ী তাহার দুই চারিটি হাঁড়িকুঁড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।

আবার আর দিকে চড়ার উপরে বহু দূর ধরিয়া কাশবন শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে, তাহাদের আশে পাশে গাছ-পালা থাকে না—চারিদিকে পোড়ো জায়গা, এবড়ো-থেবড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলা ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—

গঙ্গার চড়া

অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্ব্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

দ্বাদশ শিবমন্দির

গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সম্মুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট! কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আরো দক্ষিণে কুমারদের বাড়ী, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্ তক্ করিতেছে—কেবল একপ্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর এক দিকে তুলসীতলা।

সান্ধ্য ছবি

সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত পশ্চিম দিগন্তের ধার টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক্ হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছল্ ছল্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি

হয়। ক্রমে কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো-অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর খানিকটা আলো পড়ে—সেইটুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এ পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

স্মৃতি

এই যে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার ষ্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ সব কত দিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড় সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলে স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতর শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

হিন্দু-সমুদ্রযাত্রা

যাহারা সমুদ্রসৈকতে জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রসৈকতেই জীবন যাপন করে, তাহারা নানা কারণে সমুদ্রপথে গমনাগমনের উপায় উদ্ভাবন করিতে যত্নশীল হইয়া থাকে। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জনপদমাত্রেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দেশে দিগন্তবিস্তৃত লবণাম্বুরাশি চিরপরিখারূপে বর্ত্তমান, সেই ভারতবর্ষেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অন্যান্য জাতির ন্যায় হিন্দুরাও যে একদা নৌ-বিদ্যা-প্রভাবে দ্বীপে উপদ্বীপে আত্মকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার নিদশন অদ্যাপি একবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

হিন্দু-নৌবিদ্যা-প্রভাবের নিদর্শন

আমাদের পুরাতন সাহিত্যে যে হিন্দু-সমুদ্রযাত্রার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা নহে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্য-নিহিত দুই একটি আনুষঙ্গিক প্রমাণ লইয়া মতামত প্রদান করা নিরাপদ নহে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদমাত্রে সাহিত্য অপেক্ষা বাণিজ্যেরই সর্মাধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং পুরাতন সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত না হইলেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

—প্রাচীন সাহিত্যে নিদর্শন

কলিঙ্গদেশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ইহার সীমা কখন কখন বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত, এবং উৎকল রাজ্য কলিঙ্গের অন্তর্নিহিতভাবে বিরাজ করিত। সেই জন্য এক সময়ে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নামের মধ্যে উৎকলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই।

—কলিঙ্গদেশে নৌ-বিদ্যা

বঙ্গ ও কলিঙ্গরাজ্য হিন্দু-সমুদ্রযাত্রার প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। একদা, কলিঙ্গ প্রদেশে সমুদ্রযাত্রার প্রভাব এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, আধুনিক সমুদ্রযাত্রাকুশল ইউরোপীয় দেশের রাজকুমারদিগের ন্যায় কলিঙ্গরাজকুমারগণকেও নৌ-বিদ্যা অধিগত করিতে হইত।

বঙ্গের নৌ-বিদ্যা
—তমলুক

কলিঙ্গের ন্যায় বঙ্গের অধিবাসিবর্গও বঙ্গোপসাগরকূলে বসতি করিয়া একদা সমুদ্রযাত্রার সর্ব্বাধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সহিত সিংহলাদি দ্বীপের এবং চীনাদি দেশের ঘনিষ্ঠ সংস্রব সংস্থাপিত হইয়াছিল। তত্তদ্দেশে অদ্যাপি তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন যাহার নাম তমলুক, সেকালে তাহাই 'তাম্রলিপ্তি' নামে বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই তাম্রলিপ্তি বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার সহস্র নিদর্শনে সুশোভিত হইয়া পুরাকালে শত সৌধমালায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গভঙ্গে তাম্রলিপ্তির পাদমূল নিরন্তর অভিষিক্ত হইত! এখন তমলুকের নিকট হইতে সমুদ্রসীমা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে বাপীকূপতড়াগাদি খনন করিতে গেলে অর্ণবযানের ভগ্নাবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়া লোক-লোচনের বিস্ময় বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

বাঙ্গালীর প্রাচীন
কীর্ত্তি

সে দিন কেমন ছিল—যে দিন বাঙ্গালীর সাহস, অধ্যবসায়, অকুতোভয়তা, নীলাম্বুরাশি অতিক্রম করিয়া বহু বিদেশের রত্নভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত? সে দিন কেমন ছিল—যে দিন বাঙ্গালীর সাহিত্য, শিল্পসৌন্দর্য্য ও বাণিজ্যগৌরব কত দ্বীপোপদ্বীপের অসভ্য জনপদকে সভ্যতাসোপানে উন্নীত করিত। ভাষা দিয়া, ধর্ম্ম দিয়া, শিল্পকৌশল দিয়া নিরক্ষর বর্ব্বর

জাতিকে সমুন্নত, সুশিক্ষিত, সুশোভিত করিয়া হিন্দুগৌরবচিহ্নে জলস্থল সমুজ্জ্বল করিত—সে দিন কেমন ছিল? কবিকঙ্কণের মধুর নিক্বণ নীরব হইবার পর, বঙ্গকবিকুলচূড়ামণিগণ আর তাহার কথা সগৌরবে গাথাবদ্ধ করেন নাই! কিন্তু একজন সহৃদয় ইংরাজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়া গিয়াছেন—'আধুনিক বাঙ্গালী তৎপর হইলে এখনও পৃথিবীর সমক্ষে সে দিনের বিলুপ্ত গৌরব পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন।'

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকল্পে সমুদ্রযাত্রা বা চৈনিকগণের ভারতভ্রমণ

সে সময়ে লবণাম্বুমেখলা বঙ্গোপসাগরবেলা, বহুশত বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত শ্রমণ শ্রমণার ধর্ম্মপ্রচার কামনায় সহস্র নিদর্শন নানা দিগ্দেশে বহন করিবার জন্য পোতারোহণ কোলাহলে নিয়ত কনকনায়মান হইত। সে সময়ে যাঁহারা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিয়া অর্থাহরণ করিতেন, তাঁহাদের কল্যাণেই শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্ম, চীন প্রভৃতি দূরদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-নীতির প্রথম প্রচারের সূচনা হইয়াছিল। তৎসূত্রে চিরকর্ম্মানুরত প্রবীণ চীন ভারতভূমির সন্ধানলাভের জন্য এতদূর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোন বাঁধাই বাঁধা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। চৈনিক বৌদ্ধাচার্য্যগণ মরুমরীচিকা উত্তীর্ণ হইয়া তুষারাবৃত শৈলশিখরমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল সাগরোর্ম্মি অতিক্রম করিয়া নানাপথে দলে দলে ভারতবর্ষে উপনীত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কত যুবক পথ-ক্লেশে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কত জ্ঞানসিন্ধু আমরণ ভারতবর্ষে জ্ঞানালোচনায় অতিবাহিত করিয়া ভারতবর্ষেই জীর্ণ কঙ্কাল করিয়াছিলেন, এখন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করাও সহজ নহে! সে সকল পুরাণকাহিনী আধুনিক ইউরোপীয় মনীষিগণকেও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে!

যাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে, ফা-হিয়ানের 'ফু-কুা-কি' এবং হিয়াঙ্গথ্ সাঙ্গের 'তা-তা-সি-ইউ-কি' নামক ভারতভ্রমণকাহিনীর চৈনিক গ্রন্থ এখন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। তাহা আমাদের সমুদ্রযাত্রার ভ্রমণকাহিনীতে পরিপূর্ণ! ফা হিয়ান্ তাম্রলিপ্ত নগরে পোতারোহণ করিয়া সিংহলে ও তথা হইতে পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়া ঝঞ্ঝাবাতে পীড়িত হইয়া বহুক্লেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমাদের অর্ণবপোত কিরূপ ছিল, দিগ্দর্শনশলাকা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কি কৌশলে কোন্ পথ দিয়া পথহীন সমুদ্রবক্ষে আমাদের অর্ণবপোতসকল দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গতিবিধি করিত, ঝঞ্ঝাবাতে বা আকস্মিক বিপৎপাতে পোত জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে কি উপায়ে আরোহিবর্গের জীবনরক্ষার চেষ্টা করা হইত, ফা-হিয়ান তাহার অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

চৈনিকগণের ভারত-ভ্রমণকাহিনী

যে সকল দ্বীপে আমাদের নাবিকগণ অন্নপান-সংগ্রহের জন্য অবতরণ করিতেন, তথায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় কালক্রমে ভারতবাসীর পরাক্রান্ত উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা দ্বীপবাসী আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে বসতি করিয়া তাঁহাদিগকে ভাষা দিয়া, ধর্ম্ম দিয়া, শিল্পকৌশল দিয়া মনুষ্যপদবীতে আরোহণ করিবার জন্য কিরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, ভারতমহাসাগরবক্ষে হিন্দুসভ্যতা-বিস্তারের সেই সকল বিজয়পতাকা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হইতে পারে নাই। অদ্যাপি লম্বক ও বালীদ্বীপে হিন্দুরাজা পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া মনুসংহিতার ব্যবস্থানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন!

ভারতবাসীর উপনিবেশ

বালী ও লম্বকদ্বীপের বর্ত্তমান হিন্দুগণ প্রথমে যবদ্বীপে উপনিবেশ

সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহারা যবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেও এখনও তথায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল চিহ্নাদি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতেই পূর্ব্ব কাহিনীর প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যবদ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিদর্শন

যবদ্বীপে পূর্ব্বকালে অসভ্য ভাষাই প্রচলিত ছিল, ইতরশ্রেণীর অধিবাসিবর্গের মধ্যে এখনও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর সংস্কৃত ও আধুনিক যুগে মোসলমান ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে আরবীয় ভাষা প্রবিষ্ট হইয়া যবদ্বীপের ভাষাকে বহুধা রূপান্তরিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। এই দ্বীপে প্রধানতঃ তিনশ্রেণীর ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়,—পুস্তকাদিতে পুরাতন ভাষা, পত্রাদিতে সম্ভ্রমাত্মক ভাষা ও কথোপকথনে সাধারণ ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তিনশ্রেণীর ভাষাতেই সংস্কৃতমূলক শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; বর্ণমালাও সংস্কৃতানুযায়ী বর্ণপর্য্যায়ে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল উচ্চারণ-বিকৃতিবশতঃ সমস্ত অক্ষরগুলির আবশ্যক না থাকায় কতকগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যবদ্বীপের ভাষা

সভ্য ও অসভ্য এক সহবাসে মিলিত হইলে উভয়ের মধ্যে ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিনিময় হইয়া থাকে, যবদ্বীপেও সেইরূপ হইয়াছিল। তজ্জন্য আদিম অনার্য্য বংশে কতক ভাষা ও আচার-ব্যবহার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভূপঞ্জরের স্তরবিভাগ-প্রণালী পরীক্ষা করিয়া যেমন বলা যায়, কোন্ স্তরের পর কোন্ স্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যবদ্বীপের ভাষাতত্ত্বের স্তর পরীক্ষা করিলেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনার্য্যদেশে আর্য্যভাষা আর্য্যভাব ও আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। আর্য্যগণ কোন সময়ে ভারতবর্ষ হইতে সমাগত হইয়া

আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণ

এই স্তরবিভাগ সাধন করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা ব্যতীত যে যবদ্বীপে আর্য্যোপনিবেশ সংস্থাপিত হয় নাই, তাহা অবশ্যই বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের চিরসংস্রব। আর্য্যগণের সমুদ্রপথে দ্বীপে উপদ্বীপে গমনাগমন ও উপনিবেশ সংস্থাপন করা সত্য হইলে সেই সকল দেশে আর্য্যভাষা ব্যতীত আর্য্য-সভ্যতার পরিচায়ক আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য সাহিত্যেরও চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে কেবল মাত্র দুই চারিটি কথার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুসমুদ্রযাত্রায় আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। যবদ্বীপে তাহারও পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। সেখানে অদ্যাপি রামায়ণ মহাভারত এবং মন্বাদি শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও অধীত হইতেছে, আমাদের দেশে একদা সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের বহুল প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণ তাহার রসাস্বাদনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল বলিয়াই কালক্রমে ভাষা রামায়ণ ও ভাষা মহাভারত রচিত হইয়াছিল। যবদ্বীপেও এইরূপ ভাষা রামায়ণ ও ভাষা মহাভারত প্রচলিত আছে। সে ভাষার নাম 'কবি-ভাষা'-- তাহা সংস্কৃতমূলক---সংস্কৃতেরই রূপান্তরমাত্র। আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্য-সাহিত্য যে জনসাধারণমধ্যে কতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যবদ্বীপে আর্য্য-সাহিত্য

ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হওয়ায় যে সকল দেবদেবীর প্রতিমা গঠিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি মূর্ত্তিই যবদ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায়। এইসকল দেবমূর্ত্তির সেবাপূজার জন্য পর্ব্বত-শিখরে বা পর্ব্বতগাত্রে কত বিচিত্র দেবমন্দির গঠিত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল, তাহার কতক কাল-

দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির—চিত্রাবলী

সহকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এখনও যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। ইহা দুই একজন বিদেশীয় পান্থ বা বণিকের কীর্ত্তি বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই ; গ্রামে গ্রামে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অসংখ্য দেবমন্দির দেখিয়া পরিব্রাজকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, একদা এদেশে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ সগৌরবে শাসন-বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল দেবমন্দিরের গঠনকৌশলও আর্য্য-উপনিবেশের অভ্রান্ত নিদর্শন বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অসভ্য আদিম অধিবাসীগণের কথা দূরে থাকুক, সুসভ্য ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণও নির্ম্মাণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই সমুদায় হিন্দু-দেবমন্দিরে যে সকল চিত্রবিচিত্র আলেখ্য অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাও নিরতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। যবদ্বীপের পথঘাট নিতান্ত সংকীর্ণ, তদ্দেশে পুরাকালে অশ্বারোহণে বা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন অন্য কোনরূপে গমনাগমন করিবার উপায় ছিল না। তথা-কার পুরাতন দেবমন্দিরে ধ্বজ-পতাকা-পরিশোভিত অশ্বসংযোজিত বিচিত্রাঙ্গ রথের প্রতিকৃতি দেখিলে কে না স্বীকার করিবেন যে, তাহা তদ্দেশাগত উপনিবেশ-সংস্থাপকগণের কীর্ত্তিচিহ্ন !

দেবমন্দির-নির্ম্মাণ-কৌশল

যে দেশে ঘন ঘন ভূকম্প নিত্য ঘটনা বলিয়া পরিচিত, তথায় বহু-পুরাতন দেবমন্দিরগুলি অদ্যাপি কি কৌশলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা যথার্থই বিস্ময়কর ব্যাপার। অনুসন্ধাননিপুণ ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দিরাদির গঠনপ্রতিভার প্রশংসা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা এই সকল মন্দিরের গঠনসামগ্রীর রহস্যভেদ করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইষ্টকগুলি এরূপ মসৃণ ও সমচতুষ্কোণাকারে গঠিত ও সুসজ্জিত যে সহসা মনে হয়, বুঝি

ইষ্টকের উপর ইষ্টক স্তূপাকারে রক্ষা করিয়াই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—কোথাও কোন মসলা দ্বারা গাথনীর কার্য্য করা হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সেগুলি সুদৃঢ় অথচ চিক্কণ মসলা সহযোগে দৃঢ় আবদ্ধ। মসলা বা ইষ্টক কিছুই এতকালেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে না কেন, আধুনিক স্থপতি-বিদ্যাবিশারদগণ তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। এই সকল অতীতসাক্ষী দেবমন্দিরগুলি হিন্দুসভ্যতার, হিন্দুগঠন-কৌশলের ও হিন্দুজ্ঞান-গৌরবের অভ্রান্ত নিদর্শন।

ধূলি

ধূলির প্রভাব, বোধ হয় অনেকের নিকট অবিদিত। আমাদের

ধূলির উৎপাত

সমক্ষে ধূলি জঞ্জাল বলিয়াই পরিচিত, কেবল দ্রব্যাদি ময়লা করে—পরিচ্ছন্ন থাকিতে দেয় না। যখন রাস্তায় বাহির হই, তখন ধূলি বায়ুবেগে আমাদের নাকে মুখে গিয়া, আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে। ধূলির জ্বালায় নগরের রাজপথে গ্রীষ্মকালে বহির্গত হওয়া সময়ে সময়ে দুর্ঘট হইয়া উঠে। এমন কি, বড় বড় সহরে এই ধূলির উৎপাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অর্থব্যয় ও প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ধূলি কেবল উৎপাতমাত্র নহে। ধূলি কর্ত্তৃক অনেক বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অনেকের হয়ত ধারণা আছে, রাস্তায় ও ময়লা জায়গায় কেবল ধূলি

ধূলির ব্যাপকতা

বর্ত্তমান। সে ধারণা সম্পূর্ণ সমূলক নহে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। যে বায়ুরাশি পৃথিবীকে ঢাকিয়া রহিয়াছে, তাকেই বায়ুমণ্ডল বলিতেছি। বায়ুমণ্ডলের কোথাও এমন নির্ম্মল অংশ দেখা যায় নাই, যেখানে ধূলি নাই। কেবল যে ঝড়বাতাসের সময় বায়ু ধূলিপূর্ণ হয়, তাহা নহে। বায়ু যতই নির্ম্মল, যতই পরিচ্ছন্ন বোধ হউক না কেন, উহাতে নিয়ত ধূলিকণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সহর ও গ্রামের বায়ুর ত কথাই নাই, বিজন প্রান্তরে, নিবিড় অরণ্যে, সুবিস্তৃত সমুদ্রের উপর, উচ্চ পাহাড়ের উপর সর্ব্বত্রই ধূলি বর্ত্তমান। বেলুনে চড়িয়া ভূমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ করিলে সেখানে নির্ম্মল বায়ুমধ্যেও ধূলির অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে সকল স্থানে ধূলির পরিমাণ সমান নহে।

সহরে মনুষ্যবসতির বা কলকারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে বায়ু ধূলিতে অত্যন্ত দূষিত থাকে। পাহাড়ের উপর, সমুদ্রের উপর, জলশূন্য স্থানে বায়ু অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল।

বায়ুসাগরে ধূলিকণা

গৃহের অভ্যন্তরে বায়ু সচরাচর নির্ম্মল বোধ হয়। গবাক্ষ রুদ্ধ থাকিলে উহার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া যদি সূর্য্যরশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, রশ্মিপথে অসংখ্য ধূলিকণা বায়ুসাগরে ভাসিতেছে। সহজ অবস্থায় উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার হয় এবং ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মিতে ধূলিকণাসমূহ দীপ্তিলাভ করে, তখন তৎসমুদয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময়ে সেই আলোকরেখার নিকট কোন বস্তু আন্দোলিত করিলে ধূলিকণার সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, এবং ধূলিকণাগুলি বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ধূলিকণা বায়ুসাগরে ভাসিতেছে। এগুলি সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে চক্ষুর অগোচর এই সামান্য ধূলিকণার উপর আমাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করে।

ধূলিকণা সামান্য পদার্থ নহে

ধূলির শক্তি ও গুণের বিষয়ে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। এতদ্দ্বারা বোধ হইবে যে, ধূলিকণাটিও সামান্য পদার্থ নহে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের গবেষণায় এই সামান্য পদার্থের অসামান্য গুণ প্রকাশ হইয়াছে।

ধূলিকণার জন্য আকাশ নীলবর্ণ

আকাশ নীলবর্ণ দেখায় কেন? আকাশ ত শূন্য, সেখানে কিছুই নাই। ভূপৃষ্ঠের উপর কিছুদূর পর্য্যন্ত বায়ু আছে; তাহার উপর আর কিছুই নাই। কেবল অনন্ত শূন্য ধূ-ধূ করিতেছে। পক্ষান্তরে বায়ু একবারে বর্ণহীন। আকাশ যদি কিছু নহে, আর ভূতলের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল যদি বর্ণহীন

হয়, তবে নভোমণ্ডল নীলবর্ণ দেখায় কেন? বায়ুরাশিতে ভাসমান ধূলিকণা এই নীলবর্ণের একটি কারণ। সম্প্রতি এই তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

ধূলিকণার জন্য প্রদীপশিখা পীতাভ

প্রদীপের শিখামাত্রই প্রায় পীতবর্ণ। যেখানে প্রদীপ জ্বালান যায়, সেইখানে দীপশিখা ঘোরতর পীতবর্ণ হয়। ইহার কারণ কি? এক একটি দ্রব্যের এক একটি বিশেষ বর্ণযুক্ত আলোকের উৎপাদন-ক্ষমতা আছে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্য পোড়াইলে বিশেষ বিশেষ আলোকের উৎপত্তি হয়। আমরা যে লবণ খাই, সেই লবণে এমন একটি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা পীতবর্ণের উৎপত্তি হয়। প্রদীপের শিখায় একটু লবণচূর্ণ ধরিলে দেখিতে পাইবে, পীতবর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেই পদার্থ একটি ধাতু। ইংরাজীতে উহা সোডিয়ম্ নামে অভিহিত হয়। ঐ ধাতু ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের ঠিক্ এইরূপ পীত বর্ণ জন্মাইবার ক্ষমতা নাই। বায়ুরাশিতে যে সকল ধূলিকণা থাকে, তৎসমুদয়ের অনেকগুলিতে ঐ পদার্থ বর্ত্তমান আছে; বায়ুসাগরে যেন সর্ব্বদাই লবণের কণা ভাসিতেছে। প্রদীপ জ্বালিলে সেই লবণকণা শিখাসংস্পর্শে আসিয়া উহাকে পীতাভ করে।

বায়ুসাগরে সজীব ধূলিকণা

বায়ুতে যে সকল ধূলিকণা ভাসে, উহাদের মধ্যে অনেকগুলি সজীব জীবাণু অথবা উদ্ভিদাণু। উহাদের জীবন আছে। তালের বা খেজুরের রস কিছুক্ষণ রৌদ্রের উত্তাপে রাখিলে উহা হইতে ফেনা উঠিতে থাকে; এবং উহার মাদকতা জন্মে। ঐ রস হইতে মদ প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যটি ঐ সকল ধূলিকণা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। তালরস ও খর্জ্জুররসে চিনি আছে। বায়ুস্থিত সজীব ধূলিকণা উক্ত রসে পতিত হইয়া, ঐ চিনি

খাইতে থাকে। ক্রমে উহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়; কিয়ৎক্ষণমধ্যে দুই দশটি সজীব ধূলিকণা হইতে দুই দশ লক্ষ সজীব ধূলিকণার উৎপত্তি হয়। চিনির কিয়দংশ উহারা খাইয়া ফেলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা মদ্যে পরিণত হয়। উক্ত জীবাণু ব্যতিরেকে চিনি সুরায় পরিণত হয় না। বায়ু-সাগরে ভাসমান সজীব ধূলিকণার অস্তিত্ব কি বিচিত্র ব্যাপার!

জীবসমূহের মৃত্যু হইলে কিছুক্ষণ পরে উহাদের শরীর পচিতে থাকে। ধূলির প্রভাবেই জীবদেহ পচিয়া থাকে। জীবনহীন দেহ পাইলেই উক্ত কীটাণুসমূহ সেই দেহে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়; ক্রমে উহারা জীবশরীর ভক্ষণ করিতে করিতে সংখ্যায় অগণ্য হইয়া পড়ে। উহারা এইরূপে দলে ও সংখ্যায় পুষ্টিলাভ করে; এ দিকে সেই জীবনহীন দেহ ক্রমশঃ বিকৃত, ক্ষীণ হইয়া শেষে লোপ পায়। উহা হইতে নানাবিধ বাষ্প ও বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বায়ুরাশির সহিত সম্মিলিত হয়। জীবদেহ পচিবার কারণ ও প্রণালী এইরূপ।

নির্জীব দেহে ধূলির প্রভাব

সজীব ধূলিকণায় কেবল সুরার উৎপত্তি হয় না, কেবল জীবনহীন দেহ পচিয়া বিলুপ্ত হয় না; কিংবা কেবল ঐ জীবদেহে উক্ত সজীব ধূলিকণার বসতি স্থাপিত হয় না। সজীব ধূলিকণা জীবনহীন দেহের ন্যায় সজীব দেহও আক্রমণ করে। এই সকল জীবাণু তাদৃশ নিরীহ নহে; এমন কি মানুষের তেমন আর শত্রু নাই। উহারা কোনরূপে জীবদেহে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে রক্ত, মাংস, মজ্জা প্রভৃতি হইতে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে এবং সেইখানে উহারা দলে, বলে ও সংখ্যায় পুষ্টিলাভ

সজীব দেহে ধূলির প্রভাব

করিয়া নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি করে। ঐ সকল জীব এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সবিশেষ যত্নের সহিত না দেখিলে উহারা দৃষ্টি-গোচর হয় না। উহারা শরীরমধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে এবং সেখানে উহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকিলে, মানুষ সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

ধূলিকণায় বিবিধ ব্যাধির উৎপত্তি

মানবের অনেক মারাত্মক ব্যাধি এই ধূলিকণায় উৎপন্ন হয়। ইহাদের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। কেহ কোনরূপ জ্বরের উৎপাদন করে; কেহ হামের উৎপত্তি করে; কেহ ধনুষ্টঙ্কার, কেহ বসন্ত, কেহ যক্ষ্মা, কেহ ওলাউঠা ইত্যাদি জন্মাইয়া থাকে।

জলে জীবাণু

এই সকল জীবাণু কেবল বায়ুতে থাকে না। অনেকগুলি জলে থাকে। জল ও বায়ু আমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। অতি নির্ম্মল জল ও বায়ুতেও এই সকল প্রাণসংহারক ধূলিকণা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। উহারা মানুষ ভিন্ন পশুপক্ষী প্রভৃতির শরীরেও ব্যাধি উৎপাদন করে।

মেঘসৃষ্টিকল্পে ধূলিকণার সহায়তা

সকল সময়েই বায়ুতে জলীয় বাষ্প অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান আছে। নদী, পুষ্করিণী, হ্রদ বিশেষতঃ সমুদ্রের জলরাশি নিয়ত বাষ্পাকারে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হইতেছে। এই বাষ্প আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বায়ুর মত স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, সহসা শীতল হইলে ঐ অদৃশ্য বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। তখন আমরা দেখিতে পাই। ঐ পরিদৃশ্যমান পদার্থকে কুজ্‌ঝটিকা বা কুয়াশা বলে। কুজ্‌ঝটিকা আকাশের উর্দ্ধভাগে অবস্থিতি করিলে মেঘ বলিয়া অভিহিত

হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন, বায়ু শীতল হইলেই তত্রত্য বাষ্প জমিয়া কুজ্ঝটিকা ও মেঘের উৎপত্তি করে। কিন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক্ নহে। বায়ুস্থিত ধূলিকণা কুয়াশা ও মেঘের সৃষ্টির একটি কারণ। কেবল বায়ু শীতল হইলেই কুয়াশা হয় না। ধূলিকণা থাকা চাই। এক একটি ধূলিকণার আশ্রয়ে এক একটি জলকণার উৎপত্তি হয়। যতগুলি ধূলিকণা থাকে, জলকণাও ঠিক্ ততগুলি হয়। একখানি মেঘ বা কুজ্ঝটিকায় কত জলকণা আছে ভাবিয়া দেখ। তাহা হইলে নিশ্চল বায়ুমধ্যে কত ধূলিকণা আছে বুঝিতে পারিবে। বায়ুসাগরে এইরূপ অসংখ্য ধূলিকণা অবস্থিতি করিতেছে। বিজ্ঞানের অনুশীলনে স্থির হইয়াছে যে, ধূলিকণার আশ্রয় না পাইলে অতিশয় শৈত্যযোগেও বাষ্প জমিয়া জলকণা হইতে পারিত না।

ধূলিকণার ক্রিয়াকলাপ

এখন বুঝা গেল, সামান্য ধূলিকণার কত কাজ। উহা শূন্য আকাশ নীলবর্ণ করে। দীপশিখাকে বর্ণ দেয়। উহার অনেকে ধূলিকণামাত্র নহে, সজীব পদার্থ। উহাদের আবার অপরাপর জীবের ন্যায় জাতিবিভাগ, জন্ম, আহার, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই আছে। কেহ চিনি হইতে মদ প্রস্তুত করে, কেহ দুগ্ধ হইতে দধি উৎপত্তি করে, কেহ মাখন নবনীতকে অম্ল করে, কেহ শবদেহ গলিত ও লুপ্ত করে, জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া কেহ ধনুষ্টঙ্কার, কেহ অতিসার, কেহ জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। আবার ধূলিকণা না থাকিলে কুজ্ঝটিকা হইত না, মেঘ হইত না, বৃষ্টি হইত না। সুতরাং জীবের জীবন ধারণও অসম্ভব হইত। এইরূপ সামান্য ধূলিকণায় অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। মানব! তুমি যতই জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করিবে, ততই এতাদৃশ কত অদ্ভুত বিষয় বিদিত থাকিবে।

ভরত-মিলন

শৃঙ্গবেরপুরে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল। কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম শুধু একটু জল পান করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃণশয্যা রামের বিশালবাহু-পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, গুহক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন,—রাণীগণ এবং সচীবৃন্দের শোকও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুযত্নে ভরত জ্ঞানলাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন,—এই নাকি তাঁহার শয্যা,—যিনি আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত,—যাঁহার গৃহ পুষ্পমালা, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত,—যে গৃহশেখর শুকময়ূরের বিহারভূমি গীতবাদিত্র-শব্দে নিত্য মুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্তিসমূহ কারুকার্যের আদর্শ,—সেই গৃহপতি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়াছিলেন, একথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূল আহার করিয়া জীবন যাপন করিব।

শৃঙ্গবেরপুরে গুহক-আশ্রমে

এবার জটাবল্কল-পরিহিত শোক-বিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন। এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির নির্দ্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্রকূটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিলে ভরত এইভাবে রাণীগণের পরিচয় প্রদান করিলেন।—'ভগবন্! ঐ যে শোকে এবং অনশনে ক্ষীণদেহ সৌম্যমূর্ত্তি দেবতার ন্যায় দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের জননী; উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনাঃ অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্পকর্ণিকা তরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী- ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা, আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন—তিনি সমস্ত অনর্থের মূল বৃথা প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা— এই দুর্ভাগ্যের মাতা'। বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার অশ্রুসিক্তনয়নে জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচীবসমূহে পরিবৃত হইয়া রথত্যাগপূর্ব্বক পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ভরদ্বাজ-আশ্রমে

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকীপুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আম্র ও লোধ্রদল পক্ক হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে প্রমোদোদ্যানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্ব্বতগাত্র হইতে একটি মাত্র শৈলশৃঙ্গ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া আছে—অদূরে মন্দাকিনী,—কোথাও পুলীনশালিনী; কোথাও জলরাশির ক্ষীণ রেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে বিলীয়মান। কোথাও

চিত্রকূট

পার্ব্বত্য ফুলরাশি স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন—'রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাইতেছে না, আমি এই পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীর নির্ম্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিতেছি'। এই কথা শেষ হইতে না হইতে, দিঙ্মণ্ডল ধূলিকণায় সমাচ্ছন্ন হইল—তুমুল কোলাহলে নভঃপ্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। পশুপক্ষী চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

ভরতের সসৈন্যে আগমন

'দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার জন্য এই বনপ্রদেশে আগমন করিতেছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তুর আগমনে এই সৌম্য নিকেতনের শান্তির বিঘ্ন ঘটাইতেছে। লক্ষ্মণ সুদীর্ঘ শালতরুর উপর হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বদিকে সৈন্য-শ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন—অগ্নি নির্ব্বাপণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন'। 'কাহার সৈন্য আসিতেছে, কিছু বুঝিতে পারিলে কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন,—'অদূরে ঐ যে বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রান্তরালে ভরতের কোবিদার-চিহ্নিত রথধ্বজা দেখা যাইতেছে,—রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই। নিষ্কণ্টকে রাজশ্রী লাভ করিবার জন্য ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্পে অগ্রসর হইতেছে, আর এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব।'

ভরত দোষী নহে

রামচন্দ্র বলিলেন—'ভরত আমাদিগকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য লইতে আসিয়াছে'। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরস্নেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাবিষ্ট হৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের

উদ্দেশে আসিয়াছে। তুমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি কেন ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। যদি রাজ্য-লোভে এরূপ করিয়া থাক, তবে ভরতকে কহিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব। ধর্ম্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ভরত-আগমন

কিয়ৎকাল পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অনশন-কৃশ ও শোকের জীবন্ত মূর্ত্তি দেবোপম ভরত, রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন।—'হেমচ্ছত্র যে মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রীমণ্ডিত শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরুদ্বারা মার্জ্জিত হইত—আজ সেই অঙ্গ-রাগবিরহিত বরবপু ধূলিধূসর! যিনি আজ সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতি-পুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন, আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট সহ্য করিতেছ, এই লোক-গর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্'। বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন।

মিলন

এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন-দৃশ্য বড়ই করুণ! ভরতের মুখ শুখাইয়া গিয়াছিল। তাঁহারও মাথায় জটা-জূট, দেহে চিরবাস, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্র-জের পাদমূলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, এবং অতি আদরে উত্তোলন করিয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক তাহাকে অঙ্কে টানিয়া লইলেন; বলিলেন—'বৎস, তোমার এ বেশ কেন, তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে'।

পাদুকা-গ্রহণ

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদমূলে লুটাইয়া বলিলেন—'আমার জননী ঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার ভাই,—আপনার শিষ্য,—দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন'। বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল। ভরত বলিলেন—'আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্ত্তব্য'। কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত গ্রহণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র ভরতকে এই অবস্থায় সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন। জটাভার-শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটস্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণ যে শোভা প্রদানে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়-কালে বলিলেন—'রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব। সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব'।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—আহার

খাদ্য দ্বিবিধ

পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য তৈল ও শর্করা জাতীয় খাদ্য মাংসপেশীর শক্তির যেরূপ বৃদ্ধিসাধন করে, মাংসপ্রভৃতি অন্য জাতীয় খাদ্য হইতে তদনুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা মনে করেন যে, মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে আমরা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারি না, তাঁহাদিগের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য নহে। শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ খাদ্যকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীর খাদ্যাদি শারীরিক উপাদান পেশী-অস্থি ইত্যাদি গঠনের সহায়তা করে। মাছ, মাংস, ছানা, লবণ ও জল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য হইতে আমরা শারীরিক তাপ ও পরিশ্রম করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই। মাখন, চর্ব্বী, তৈল, ঘৃত, অন্ন, রুটী, আলু, চিনি, গুড় প্রভৃতি তৈল ও শর্করা জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিলে, শারীরিক উপাদানসমূহের যে ক্ষয় সাধিত হয়, তাহার পূরণের জন্য মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিমাণের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইলেও তৈল ও শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিশেষ আবশ্যক হয়। এই সত্য ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে, মল্লভূমিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অপর যেখানে পেশী-সমূহের সমধিক চালনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তথায় অভ্রান্ত পরীক্ষা-দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বয়সভেদে, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে, দেশভেদে, জাতিভেদে, ধর্ম্মভেদে ও রুচিভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের অল্পবিস্তর তারতম্য হইয়া থাকে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের পর আর আমাদিগের শরীরের বৃদ্ধি সাধিত হয় না, সুতরাং বালক ও যুবকদিগের শরীরের বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির তাহার প্রয়োজন হয় না। এজন্য বালক ও যুবকদিগের যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের বিশেষতঃ মাংসজাতীয় খাদ্য, যেমন মাছ, মাংস, ডিম্ব, ছানা, ডাল ইত্যাদি—অভাব হইলে তাহাদিগের দেহ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, বালকদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য প্রদান করিলে তাহাদিগের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে শুদ্ধ যে অজীর্ণাদিরোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নহে,- শরীরে অধিক পরিমাণে মেদ সাধিত হইয়া বালককে অত্যধিক স্থূল সুতরাং একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে।

খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণভেদ

স্ত্রীপুরুষ-ভেদে খাদ্যের পরিমাণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য হইয়া থাকে। পুরুষেরা যত খাদ্য গ্রহণ করে, সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগের সচরাচর তাহা অপেক্ষা শতকরা দশভাগ কম খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

স্ত্রীপুরুষ-ভেদে খাদ্যের পরিমাণ-পার্থক্য

দেশভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের প্রভেদ হইয়া থাকে, শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয় এবং বাহিরের প্রচণ্ড শীত হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহা-দিগের অধিক তাপের প্রয়োজন হয়। এই জন্য এই সকল স্থানে অধিক পরিমাণ তৈলজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে

দেশভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণভেদ

মাংসের ব্যবহার যথোচিত পরিমাণে সংযত হওয়া উচিত; তাহা না হইলে অনেক সময়ে যকৃতের দুরারোগ্য পীড়া উপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ঋতুভেদে পৃথক্ পৃথক্ খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা, অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, অনেকস্থলে তাহাদের কারণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও ঐ সকল বিধিব্যবস্থা যে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এক্ষণে পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

চরকের মতে বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী আহার

চরকের মতে ঋতুর উপযোগী আহার-বিহারাদি সম্পন্ন হইলে মনুষ্যের বর্ণের স্ফুরণ হয় এবং বর্ণ ও আয়ুর বৃদ্ধি সংসাধিত হয়। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এই ছয় ঋতুতে বৎসর বিভক্ত। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন সূর্য্য উত্তরায়ণ অবলম্বন করে, তখন শরীরের রস শুষ্ক হয় এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। পুনশ্চ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালে, সূর্য্য যখন দক্ষিণায়ন আশ্রয় করে, তখন শরীরে রসের ও বলের আধিক্য হয়। চরকের মতে গ্রীষ্মকালের শেষে ও বর্ষাকালের প্রারম্ভে মনুষ্য হীনবল হয়। শরৎ ও বসন্তে মধ্যবল এবং হেমন্ত ও শীতের প্রারম্ভে মানুষের বল সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

হেমন্তে

চরক বলেন,—যিনি হেমন্ত কালে প্রতিদিন ঘৃত-দুগ্ধাদি গব্যরস, গুড়, বসা, মজ্জা, তৈল ও নবান্ন আহার এবং উষ্ণ জল পান করেন, তাঁহার আয়ুষ্কাল কখন হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, শীতকালে জঠরাগ্নির উদ্দীপনা অধিক হয়। সুতরাং এই সময়ে আমাদিগের গুরুপাক দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। শীতকালে অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করিবার আবশ্যকতা

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং জলজন্তু—মৎস্য-কচ্ছপাদি—আনূপ মাংস, বন্য মৃগ, বরাহ ইত্যাদির ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রবল প্রকোপ হইয়া নানারোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

বসন্তে

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ, বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ অপেক্ষা শ্লেষ্মার প্রকোপ বিশেষ অনিষ্টকর মনে করিয়া থাকেন। এ জন্য তাঁহারা বসন্তকালে গুরুপাক দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং মিষ্ট দ্রব্য বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সময়ে শরভ, শশক প্রভৃতি প্রাণীর মাংস প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে স্বাদু, শীতল, তরল ও স্নেহময় দ্রব্যাদি ভক্ষণ করা

গ্রীষ্মে

উচিত। চরকের মতে শর্করামিশ্রিত ছাতু, জাঙ্গল পশু মৃগ, শশক ইত্যাদি প্রাণীর ও পক্ষীর মাংস এবং শালি তণ্ডুলের অন্ন ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভোজন করিলে গ্রীষ্মে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য এই ঋতুতে একেবারে বর্জ্জন করিবে।

বর্ষাকালে দেহ ও অগ্নি (জঠরাগ্নি) উভয়ই দুর্ব্বল হয় এবং বায়ুর

বর্ষায়

প্রকোপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে অম্ল লবণ ও স্নেহরসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। যিনি বর্ষাকালে অগ্নি সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুরাতন যব, তণ্ডুল, গোধূম ও জাঙ্গল মাংসের যূষ আহার করিবেন। এই ঋতুতে জল উত্তপ্ত করিয়া শীতল করতঃ পান করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শরৎকালে শরীরে পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এজন্য এই

শরতে

ঋতুতে পিত্তদমনকারী খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সময়ে মধুর, লঘু, শীতল ও তিক্ত খাদ্যদ্রব্য এবং পিত্তপ্রশমনকারী অন্নপানাদি ব্যবহার করা উচিত। এবং শশক, তিতির

প্রভৃতির মাংস, যব, গোধূম এবং শালি ধান্যের ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, মৎস্য, আনূপমাংস ও দধি ভক্ষণ এই ঋতুতে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

দধি

আজকাল আমরা দধি সকল ঋতুতে সকল সময়েই ব্যবহার করিয়া থাকি। দধি একটি উৎকৃষ্ট অম্লরসবিশিষ্ট সারবান্ খাদ্য। শর্করা ব্যতীত দুধের অপর সকল সার পদার্থ দধির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিত মেচ্‌নিকফের মতে দধি ভক্ষণ করিয়া আমাদিগের অন্ত্রমধ্যস্থ অনিষ্টকারী রোগোৎপাদক বীজাণুসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমরা বহুদিন সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারি এবং অকাল বার্দ্ধক্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদমতে দধি একটি হিতকর খাদ্য সামগ্রী হইলেও সর্ব্বকালে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। চরক বলেন যে--রাত্রিকালে দধি ভোজন করিবে না এবং দধি উষ্ণ করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। শর্করাসংযুক্ত দধি ভোজন পিত্তকে সংক্ষুভিত হইতে দেয় না। পরন্তু, আহার পরিপাক এবং তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ করে। মধুযুক্ত দধি সুমিষ্ট ও অল্পদোষবিশিষ্ট হয়। আমলকীর রস মিশাইয়া দধি ভক্ষণ করিলে, উহা ত্রিদোষ নাশ করে। শরৎকালে দধি ভোজন নিষেধ করা হইয়াছে। অপরিমিত দধি ভোজনে দধির অম্লরস দেহমধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া সর্দ্দী, কাসী, বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি সাধন করে।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা ঋতুভেদে বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা ব্যতীত ইহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা তিথিভেদে খাদ্যবিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহার যথার্থ মর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, এরূপ ব্যবস্থায়

প্রত্যহ একরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিবার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

সকলবয়সেই অতি ভোজন প্রভৃত অনিষ্টের কারণ। এককালে অধিক আহার না করিয়া তিন চারিবারে অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এককালে অধিক আহার করিলে পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। পাকস্থলী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উহার পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয়। গুরু ভোজনে শরীর জড়ভাবাপন্ন হয় এবং কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের কার্য্যে অপটু হইয়া পড়ে।

অতিভোজনের অপকারিতা

প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। রাত্রে স্বল্পাহারই প্রশস্ত। নিদ্রাকালে পরিপাকক্রিয়া ধীরভাবে সম্পন্ন হয়, এজন্য রাত্রিকালে ভোজনের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া অবিধেয়।

ভোজনের নির্দ্দিষ্ট কাল

অধুনা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, অধিকাংশ রোগের বীজ ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত থাকে। বাতাসের সাহায্যে ধূলি উড়িয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে পতিত হয় এবং তাহার সাহায্যে ঐ সকল বীজ আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ উৎকট রোগ উৎপাদন করে। বাজারের খাবার যে বিশেষ অনিষ্টকর, তাহার কারণ যে শুদ্ধ ভেজাল-দ্রব্যে এ সকল পদার্থ প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহা নহে। খাবার জিনিষ দোকানে যেরূপ ভাবে রক্ষিত হয়, তাহাতে নানাবিধ রোগের বীজ-মিশ্রিত পথের ধূলি উহার উপর অনবরত পতিত হয়। সুতরাং রোগোৎ-পাদন করিবার শক্তি বাজারের খাবারের মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে বিদ্যমান থাকে।

ধূলিকণার বীজাণু

তাড়াতাড়ি ভোজন করা অতি অনিষ্টমূলক। সুপরিপাকের জন্য খাদ্যদ্রব্য অতি সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। খাদ্য যে কেবল চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইবার প্রয়োজন, তাহা নহে, মুখের লালার সহিত উহার উত্তমরূপে মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। মুখের লালা একটি পাচক রস। আমরা ভাত, রুটী, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারঘটিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকি। উহারা মুখের লালার সাহায্যে শর্করায় পরিণত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের অধিকাংশ খাদ্যই শ্বেতসার-ঘটিত। খাদ্য দ্রব্য একবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে লালার পাচকক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়, সুতরাং শ্বেতসারঘটিত খাদ্য যত অধিকক্ষণ মুখের মধ্যে রাখিতে পারা যায়, ততই পরিপাকের সুবিধা হইয়া থাকে। তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে, খাদ্য যে শুদ্ধ দুষ্পাচ্য হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে, তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সার পদার্থ আমাদের দোষে এইরূপে অসার পদার্থরূপে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

তাড়াতাড়ি ভোজনের অপকারিতা

আহারের সময় বা অব্যবহিত পরে অধিক জল বা বরফ-জল অথবা বরফদ্বারা শীতল করা কোন পানীয় গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহাদ্বারা পাকাশয়স্থিত পাচক রস অধিকতর তরল এবং ভুক্ত দ্রব্য শীতল হইয়া পরিপাক-কার্য্যের সবিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। আহারের সময় অল্প মাত্রায় জলপান করিয়া আহারের দুই এক ঘণ্টা পরে যথাপ্রয়োজন জলপান করিলে কোন ক্ষতি হয় না।

আহারের পর জলপানের ব্যবস্থা

পম্পিয়াই

পম্পিয়াই ও বিসুবিয়স

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পম্পিয়াই নগরের ভগ্নাবশেষ—মানবের স্পর্দ্ধার ভগ্নস্তূপ—পৃথিবীর ধন, জন, শোভা, সমৃদ্ধির নশ্বরত্বের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই পম্পিয়াই নগর এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সভ্য জগতের মধ্যে শোভা ও সমৃদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরগুলির প্রতিযোগিতা করিত। নানা দেশ হইতে কত কত দর্শক এই নগর দেখিতে আসিয়া ধন্য ধন্য করিয়া যাইত। ইহার স্থাপত্যকীর্ত্তির প্রশংসা তখন লোকের মুখে ধরিত না। তাহার পর ঐ অদূরে দণ্ডায়মান ভীষণদর্শন, মহাকালের নির্ম্মম প্রতিনিধি বিসুবিয়স, তাহার পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মানবের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অপবিত্র জলধারা ঢালিয়া দিয়া ঐ শোভাসম্পদ্-ভূষিত নগরের মস্তকোপরি গলিত ধাতুদ্রব্য ঢালিয়া দিল, এত বড় সমৃদ্ধ নগরকে ভস্মে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। পম্পিয়াই নগরের কোন চিহ্নমাত্র রাখিল না। কোথায় অদৃশ্য হইল সেই অট্টালিকাশ্রেণী, কোথায় চলিয়া গেল তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য, কোথায় গলিয়া গেল তাহার কর্ম্মকোলাহল! অতীত গৌরবের সাক্ষী রহিল ভগ্নস্তূপ! মহাকালের মহাখেলা!

ভস্মাচ্ছাদিত পম্পিয়াই

বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরি হইতে বিক্ষিপ্ত ভস্মরাশি পম্পিয়াই নগরকে লোকলোচনের অদৃশ্য করিয়াছিল, কিন্তু সেই ভস্মরাশি এতকাল কৃপণের ধনের মত এই সহরটিকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পূর্ব্বে যদি কেহ পম্পিয়াই নগরের অবস্থিতিস্থান দর্শন করিতে যাইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত প্রান্তর রহিয়াছে। সেই প্রান্তরের উপর দিয়া পবন হায় হায় করিয়া ফিরিতেছে।

কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন এই পম্পিয়াই শোভা, সমৃদ্ধি, ধন, জন, প্রভুত্ব, সম্মানে পৃথিবীর প্রধান নগরসমূহের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছিল। এমন একদিন ছিল, যখন রোমের ধনাঢ্য বণিগ্‌গণ এই স্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য আগমন করিতেন; তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সৌধসমূহ তাঁহাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিত; তাঁহাদের আমোদ-আনন্দে বিলাস-বিভ্রমে এই নগর মুখর হইত। সম্রাট্‌ নিরোর রাজত্বকালে এই পম্পিয়াই নগর বিলাসীদিগের ভোগবিলাসের স্থান ছিল। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শেষভাগে এই নগরোপকণ্ঠে সুন্দর সুন্দর উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। রোমের সম্রাট্‌ ক্লডিয়াস্‌ এই নগরের প্রান্তে একটি সুদৃশ্য সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং তিনি মধ্যে মধ্যে অবসরসময়ে এখানে বাস করিতেন। এই স্থানে সিসিরো অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, সম্রাট্‌ অগষ্টাস্‌ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ সেনেকা ঠিক্‌ কথাই বলিয়াছিলেন যে, এই নগর বিখ্যাত ছিল—গোলাপ ফুলের জন্য, মদের জন্য আর বিলাসের জন্য। পণ্ডিতবর সেনেকার এই তিনটি কথা দ্বারাই সেকালের, সেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন সময়ের পম্পিয়াইর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নগরে সে সময়ে বিলাসের সহস্র উপকরণ স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ছিল; অর্থের সাহায্যে মানুষ যতপ্রকার সুখ-সম্ভোগ করিতে পারে, যতপ্রকার বিলাস-সামগ্রী আহরণ করিতে পারে, এ নগরে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ছিল সকলই—ছিলনা শুধু দূরদৃষ্টি!

পম্পিয়াই নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি

ঐ যে অদূরে ভীষণকায় বিসুবিয়স্‌ নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এই নগরের শোভা সৌন্দর্য্য বিলাসসম্ভার দেখিয়া হাস্য করিতেছিল,

তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কেহই স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদিন ঐ পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইবে; এবং ভোগবতী ধারার পরিবর্ত্তে গলিত ধাতুদ্রব্যের ধারা প্রবাহিত হইয়া ভস্মরাশি উত্থিত হইয়া এই পরম রমণীয় নগর ডুবাইয়া দিবে,সমস্ত বিলাসবাসনকে ভগ্নস্তূপের নিম্নে সমাহিত করিবে! তখন আর বিস্তৃত সুশোভিত কোরম-গৃহে সহস্র সহস্র নাগরিক সম্মিলিত হইয়া আনন্দকোলাহলে গগন মুখরিত করিবে না। তখন আর রাজপথে যানবাহন চলিবে না, তখন আর সুদৃশ্য স্নানাগারগুলিতে স্নাতক যাইবে না।—তখন সমস্তই সে মহাকালের প্রেরিত গলিত ধাতুদ্রব্য ও ভস্মরাশির মধ্যে সমাহিত হইবে।

দূরদৃষ্টির অভাব

সে আজ ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।—বিসুবিয়স্ পর্ব্বত তখন পাষাণকায় উন্নত করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান ছিল। এবং এই সুদৃশ্য নগরের প্রচ্ছদপটের শোভাবৃদ্ধি করিত। কেহই তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, এই নীরব পাষাণস্তূপ এই সুন্দর জীবন্ত নগরকে সমাহিত করিবার জন্য তাহার হৃদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে অগ্নি সঞ্চয় করিতেছে। খ্রীষ্টীয় ৬৩ অব্দে নগরবাসিগণ প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, বিসুবিয়স্ নীরব পাষাণস্তূপ নহে। সেই সময়ে একদিন প্রবল ভূমিকম্পে সকলকে জানাইয়া দিল, বিসুবিয়স্ চঞ্চল হইয়াছে। সেই ভীষণ ভূমিকম্পে এই সাধের নগরের বহুতর অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। অনেক সুদৃশ্য উদ্যানবাটিকা, রঙ্গমঞ্চ, অভ্রভেদী প্রাসাদ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেল; নগরে হাহাকার উঠিল; কিন্তু তখনও কেহ মনে করেন নাই যে, মহাকালের মহানর্ত্তনের এই সবে আরম্ভ। সকলেই তখন ভগ্ন গৃহের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, পুরাতনের স্থানে নূতন অট্টালিকা, অধিকতর সুদৃশ্য প্রমোদভবন নির্ম্মাণের

বিসুবিয়সের ইঙ্গিত

আয়োজন করিতে লাগিলেন। দূরে দাঁড়াইয়া বিসুবিয়স্ এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল; সে বুঝিল যে, একবারের কম্পনে লোকের চৈতন্যোদয় হইল না। পরবর্ত্তী বৎসরে আবার প্রবলতর ভূমিকম্পে পম্পিয়াই নগরকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল; যে সমস্ত অট্টালিকার সংস্কার আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগের আরও অধিকতর সংস্কারের প্রয়োজন হইল। যে সমস্ত গৃহ পূর্ব্ববারের কম্পনেও স্থির ছিল, তাহারা এবার ধরাশায়ী হইল। ভগ্নস্তূপের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইল।

নগরবাসীর অনবধানতা

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, নগরবাসিগণ মহাকালের এই স্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না। তাহারা চতুর্গুণ উৎসাহে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ভগ্নপ্রস্তর ও ইষ্টকরাশি সংগ্রহ করিয়া নূতন নগর নির্ম্মাণে বদ্ধপরিকর হইল। যে গুলির সংস্কার করা সম্ভবপর হইল, তাহার সংস্কারসাধনে উপযুক্ত শিল্পী নিয়োজিত হইল। নূতন ও অধিকতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন নূতন নগর নির্ম্মাণের বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। নানাদেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রী ও উৎকৃষ্ট শিল্পীদিগকে নগর নির্ম্মাণের জন্য লইয়া আসা হইল। নবীনোৎসাহে বিপুল উদ্যমে নগরনির্ম্মাণকার্য্য চলিতে লাগিল। বিসুবিয়স্ দেখিল, দুইবারের কম্পনেও লোকে মহাকালের ইঙ্গিত বুঝিল না। তখন তদপেক্ষাও কঠোর কিছুর প্রয়োজন হইল: মানবের দর্প—তাহাদের ধনজনের, অর্থসামর্থ্যের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য গুরুতম অস্ত্রের প্রয়োজন হইল।

পম্পিয়াই সমাহিত

তখনও অনেক অট্টালিকার, অনেক রাজপ্রাসাদের সংস্কারকার্য্য শেষ হয় নাই। তখনও নূতন নগর মস্তক উত্তোলন করিয়া শোভাসম্পদের স্পর্দ্ধা করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। সেই সময়ে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর তারিখে

বিসুবিয়স সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিল। এবার আর কম্পন নহে—এবার সেই পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গলিত ধাতুদ্রব্য, বহুকালের সঞ্চিত প্রস্তর ও ভস্মরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত নগর চিরদিনের জন্য সমাহিত করিল। গোলাপবাগ, মদিরার উৎস, বিলাসের অলকা নির্ম্মাণের চেষ্টা চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া গেল—পাশ্চাত্য জগতের বিলাসিতার একটি কেন্দ্র ভস্মের মধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া শাপাবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিল। মহাকাল বড়ই কঠোর শাস্তিবিধান করিয়া ক্ষুদ্র মানবের স্পর্দ্ধা ও দর্প চূর্ণ করিয়া দিলেন।

প্লিনি

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লিনি, এই শোচনীয় কাণ্ডের একটি অতি বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সময় যুবক প্লিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার খুল্লতাত প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ প্লিনি মহোদয় এই সময়ে পম্পিয়াই নগরে ছিলেন এবং তিনি অগ্ন্যুৎপাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন। যুবক প্লিনি এই সময়ের ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত টাসিটস্‌কে কয়েকখানি পত্র লিখেন। আমরা তাঁহার লিখিত দ্বিতীয় পত্রের অংশবিশেষের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্লিনি-লিখিত বিবরণ

প্লিনি বলিয়াছেন—'তখন সবে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, তখন প্রথম ঘণ্টা—তখন আলোক ছিল, কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট—মলিন—নির্ব্বাণোন্মুখ—চারিদিকের অট্টালিকাসমূহ ক্রমাগত কম্পিত হইতেছিল। এখন ভূমিকম্পে সমুদ্র দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ভূমিকম্পনে সমুদ্রের জলরাশি এক একবার স্ফীত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতেছিল। আবার দ্রুতগতিতে বহুদূর চলিয়া যাইতেছিল; সামুদ্রিক জীব-

গণ তীরভূমিতে পড়িয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাইলাম, অদূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি সঞ্চিত হইতেছে; আমরা তখন ইহাকে মেঘ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। তাহার পরেই দেখিলাম, সেই মেঘরাশিমধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। সেই মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া অগ্নিময় আলোকরেখা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সে এক ভীষণ দৃশ্য! দেখিতে দেখিতে এই মেঘরাশি সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইল এবং ক্রমেই নিম্নে নামিয়া ভাসিতে লাগিল। তাহার পরেই নগরের উপর ভস্মরাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। এই বর্ষণ গভীর নহে। তখন চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তখন যে, যে দিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার পর অবিশ্রান্ত গলিত ধাতুদ্রব্য ও ভস্মবর্ষণে নগর ডুবিয়া গেল।

পুনরুদ্ধার-প্রয়াস

এই শোচনীয় ঘটনার বহুকাল পরে এই নগরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়; এখনও সে চেষ্টা চলিতেছে। ভস্মরাশি বহুকাল এই সমৃদ্ধ নগরকে বুকের মধ্যে রাখিয়াছিল; তাহার পরে ক্রমে ক্রমে সেই ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া মনোরম অট্টালিকা, সুন্দর প্রমোদভবন সকল বাহির করা হইয়াছে। এখনও অনেক স্থান ভস্মাচ্ছাদিত আছে। ইহাই পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসের ইতিহাস।

মনুষ্যের সংহারকার্য্য

বহু পূর্ব্বে মানুষ যে দিন উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী হইয়া অল্পবুদ্ধি প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে দিন হইতে যে কেবল দুর্ব্বল জীবের সহিতই মানুষের শক্রতা চলিতেছে, তাহা নয়। প্রকৃতির সহিতও মানুষের এক নীরব সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে কোটি কোটি নিরীহ জীব প্রাণদান করিয়াছে, তাহা ছাড়া পৃথিবীর নানা অংশের বনভূমিগুলি তৃণহীন শুষ্ক মরুতে পরিণত হইয়া এবং নির্ম্মলসলিল নদীগুলি কলুষিত ও পঙ্কিল হইয়া প্রকৃতির স্নেহভরা পবিত্র শ্যামল কান্তিকে ক্রমেই কর্কশ করিয়া তুলিতেছে।

প্রকৃতির সহিত মানবের নীরব সংগ্রাম

পরিবর্ত্তন লইয়াই প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। ধরাবক্ষে যখন মানুষ স্থান পায় নাই, তখন ইহা চলিত এবং এখনও চলিতেছে। এ সবই সত্য! সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান আপনা হইতেই উচুনীচু হইতেছে এবং দেশের ঋতু-পরিবর্ত্তন চলিতেছে। পশুপক্ষী লতাগুল্ম পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকিতে গিয়া নিজেদের দেহের কতই পরিবর্ত্তন করিতেছে, হয়ত তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া অপর কোন সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। এই সবগুলিও সত্য! কিন্তু প্রকৃতির স্বেচ্ছাকৃত এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তনে কোন অমঙ্গল-লক্ষণ দেখা যায় না। মানুষ নিজের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির পটে যে তুলিকাপাত করে, তাহাই সেই শান্তচ্ছবিকে ক্রমে কর্কশ করিয়া তুলে। ইহাতে পৃথিবীর যে অমঙ্গল হয়, তাহার ফল অতি ভয়ানক।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন

প্রকৃতির রাজ্যে অকল্যাণ আনয়নব্যাপারে, একমাত্র আধুনিক সভ্য জাতিই দায়ী নহে, মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তখন হইতেই নিরীহ প্রাণীদিগের হত্যা আরম্ভ করিয়া ইহারা প্রাণিজগতের এত ক্ষতি করিয়া আসিতেছে যে, তাহার আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই পাপের ফলেই এখন ধরাপৃষ্ঠে সুস্থকায় স্বচ্ছন্দচর প্রাণী দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে, এবং অনেক প্রাণিজাতির বংশলোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। এখন মৃৎ-প্রোথিত কঙ্কালে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়।

প্রকৃতিরাজ্যে অকল্যাণ

অনেক বন্য পশুকে বুদ্ধিবলে পোষ মানাইয়া আমরা এখন তাহা-দিগকে গার্হস্থ্য সম্পদ্ করিয়া তুলিয়াছি সত্য; কিন্তু এই ব্যবস্থায় তাহারা এত হীনবীর্য্য এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে যে, নিজের কীর্ত্তির জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই যথেচ্ছাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সম্ভবতঃ কয়েকটি খাদ্যপ্রদ উদ্ভিদ্ এবং আর কয়েকটি অত্যাবশ্যক প্রাণী ছাড়া ক্রমে অন্য সকলেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এবং শেষে সেগুলিরও পর্য্যন্ত বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মানুষ আসৃষ্টি এত লালায়িত, উদ্ভিদ্‌হীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থায় তাহার পূর্ণতা হইবে বটে, কিন্তু সে অবস্থা কখনই মানুষের জীবন রক্ষার অনুকূল হইবে না।

মানুষের যথেচ্ছা-চারিতায় উচ্ছেদক্রিয়া

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয় স্ফুটতর হইবে। অসভ্য মানুষ অনৈতিহাসিক যুগে আধুনিক যুগের মানুষদিগের ন্যায় বন্দুক কামান ব্যবহার করিতে পারিত না সত্য, তথাপি তাহারা শিলাময় অস্ত্রশস্ত্রাদির আঘাতে ম্যামথ্ নামক হস্তিজাতীয় জীবের বংশনাশের যে সহায়তা করে নাই, একথা কোন কালেই বলা

ম্যামথ্ ও বন্য অশ্ব

যায় না। ম্যামথ্ আর ধরাপৃষ্ঠ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গভীর ভূস্তরে প্রোথিত কঙ্কালদ্বারাই এখন তাহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অতি প্রাচীন কালে আমেরিকার সর্ব্বাংশে নানাজাতীয় বন্য অশ্ব দলে দলে আনন্দে বিচরণ করিত। আজকাল তাহাদের একটিও ভূপৃষ্ঠে নাই। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের তিরোভাবকেও মানুষের কীর্ত্তি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি চালাইয়া এই জীব-বংশ লোপ করে নাই সত্য, কিন্তু যে সকল সংক্রামক এবং সাংঘাতিক ব্যাধি দ্বারা তাহারা নির্ব্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। যখন আমেরিকার বনভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন আরব্ধ হইয়াছিল, তখন ইউরোপ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে বৈদেশিকগণ পীড়ার বীজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে আনিয়া বন্য অশ্বগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল।

প্রাকৃতিক উৎপাত—বাইসন্ ও গোজাতি উচ্ছেদ জন্য মনুষ্যই দায়ী

আমরা যে দুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথা বলিলাম, তাহাকে কেবল মানুষের কীর্ত্তি বলিয়াই সকলে স্বীকার করেন না, প্রাকৃতিক অবস্থার যে সকল পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই চলিতেছে, তাহার ফলে, অনেক জীবের বংশলোপ ঘটিয়াছে এবং অনেক নূতন জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে এই প্রকার ঘটনার শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়। ম্যামথ্ এবং বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ ঐ প্রকার প্রাকৃতিক উৎপাতেরই ফল বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বাইসন্ নামক মহিষজাতীয় জন্তুর যে তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। বাইসন্ এবং ইউরোপের বন্য

গোজাতির উচ্ছেদের জন্য এক মানুষই দায়ী। আবাসভূমিগুলিকে অরণ্যবর্জ্জিত করিয়া মানুষই তাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছিল এবং সেই মানুষই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের বংশলোপ ঘটাইয়াছে। নেকৃড়ে বাঘ এবং বীবরজাতীয় প্রাণিগুলিও ঐ প্রকার অত্যাচারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুইডেন্, নরওয়ে, রুষিয়া এবং ফ্রান্স হইতেও ইহারা ক্রমে তাড়িত হইতেছে। আর শত বৎসর পরে, পৃথিবীর কোন অংশেই ঐ দুই প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

অন্যবিধ উদাহরণ

অতি প্রাচীনকালে ভল্লুক পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই দেখা যাইত। মানুষের অত্যাচারেই তাহাদিগকে ইংলণ্ড ছাড়িতে হইয়াছে। সিংহ ইউরোপের আর কোন অংশেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মেসিডোনিয়া এবং এসিয়ামাইনরে যে প্রচুর সিংহ ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। জীরাফ এবং হস্তীও ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। এই সকল প্রাণীর উচ্ছেদ-কার্য্যের জন্য এক মানুষই দায়ী।

পতঙ্গ ও পক্ষীর উচ্ছেদ

পক্ষী এবং পতঙ্গজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি মানুষের নৃশংসতা হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। আধুনিক সুসভ্য মানুষের বিলাসের উপকরণ যোগাইবার জন্য অষ্ট্রীচ্, ময়ূর প্রভৃতি যে কত পক্ষীর বংশলোপ হইতে বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

মনুষ্য কর্ত্তৃক নদী ও জলাশয় দূষিত

বড় বড় নদনদী এবং জলাশয়গুলির জল দূষিত করিয়া মানুষ নানা জলচর প্রাণীর যে সংহার কার্য্য নীরবে চালাইতেছে, তাহা আরও ভয়ানক। জলাশয়ের জল নির্ম্মল রাখিতে জলচর প্রাণী যথেষ্ট সাহায্য করে। আমাদের কলকারখানার আবর্জ্জনা ও ড্রেনের দূষিত পদার্থযোগে

নদীজল এত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে যে, পরম হিতকর জলচর প্রাণি-গণও আর জলে থাকিতে পারিতেছে না। ক্রমেই তাহারা নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে পূর্ণ। টেমস্ নদীতে আর তেমন মৎস্য পাওয়া যায় না এবং ভাগীরথী ও পদ্মা মৎস্য-হীন হইয়া আসিতেছে।

মনুষ্য কর্ত্তৃক উদ্ভিদের উচ্ছেদ

প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদ্‌দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানুষের সংহারকার্য্যের ধারাবাহিকতা সেখানে দেখা যায়। গাছ কাটিয়া বন পুড়াইয়া মানুষ জগতের ও নিজের যে অনিষ্ট করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিবার নহে। ভূপৃষ্ঠ সচ্ছিদ্র—উদ্ভিদ্‌দিগের গভীর এবং সুদূরবিস্তৃত মূল মৃত্তিকাকে জমাট বান্ধিতে না দিয়া উহার সচ্ছিদ্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বর্ষার জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে শিকড়সংলগ্ন মৃত্তিকা স্পঞ্জের ন্যায় সেই জল ধরিয়া রাখে। তার পর যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ডসূর্য্যতাপে ভূপৃষ্ঠ ও জলাশয়গুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই অরণ্যতলে সঞ্চিত জলরাশি মাটির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করিতে থাকে। অরণ্যের এই জলসঞ্চরণ কাজটি বড় কম ব্যাপার নহে। বড় বড় জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলিলেই যে, দেশে জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

বৃক্ষের উপকারিতা ও অরণ্যধ্বংসের অপকারিতা

বৃক্ষসকল তাহাদের মূলদ্বারা কেবল জল আবদ্ধ রাখিয়াই যে দেশের হিতসাধন করে, তাহা নহে। স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও ইহাদের অনেক কাজ আছে। অতি শুষ্ক, অতি আর্দ্র বায়ুর মধ্যে কোনটিই স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। এক নির্দ্দিষ্ট-

পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত থাকিলে কেবল তাহাই আমাদের হিতকর হয়। উদ্ভিদ্‌দেহ হইতে অবিরাম যে জলীয় বাষ্প বহির্গত হয়, তাহাই শুষ্কতা নিবারণ করিয়া বায়ু প্রাণীর স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া তুলে। অরণ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া স্পেন যে কুকার্য্য করিয়াছিল, এখন দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। মার্কিণেরাও ধীরে ধীরে অরণ্য উচ্ছেদের কুফল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চীন এবং তিব্বতের সীমান্তপ্রদেশ কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বে উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দেশ অরণ্যহীন করায় এখন তাহা প্রাণিচিহ্ন-বর্জ্জিত মহা প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

মরুভূমির বিস্তারে মনুষ্যের সহায়তা।

পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল সুবিস্তৃত মরুভূমি আছে, তাহাদের উৎপত্তির জন্য মানুষকে অবশ্যই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি স্থানে যে সকল স্বল্পায়ত মরুভূমি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া শ্যামল উর্ব্বর ভূখণ্ডকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। প্রাণিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখা দিলে, তাহা যেমন ক্রমেই বিস্তার লাভ করিয়া সুস্থ অংশে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, ক্ষুদ্র মরুভূমিগুলিও সেই প্রকার ক্ষতের ন্যায়ই বিস্তার লাভ করিয়া পার্শ্বস্থ উর্ব্বর ভূভাগকে কুক্ষিগত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মরুভূমির এইপ্রকার ক্রমবিস্তার ভূপৃষ্ঠের ব্যাধিবিশেষ; সুতরাং ইহার নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুভূমির উৎপাদন করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। এইগুলি যখন কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভূভাগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন মানুষ নিজের কুকর্ম্মের ফল আরও দেখিতে পাইবে।

বর্ষায় পল্লীদৃশ্য

সহরে বসিয়া বর্ষার পূর্ণ প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায় না। সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর হাত চালাইয়া যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়াছে, বাহ্য প্রকৃতি তাহার উপর অসঙ্কোচে তাহার লীলাঞ্চল প্রসারিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু পল্লীপ্রকৃতি সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে। এখানে বর্ষা, তাহার সকল সুখ-দুঃখ, সকল বিভব-সম্পদ্ লইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। নগরবাসিগণের সে সুখ সে দুঃখ উভয়ই বোধ হয় অপ্রীতিকর। কিন্তু কবিচিত্ত তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা যে কেবল মেঘদূতের অম্লান কবিত্ব হৃদয়ের মধ্যে জাগাইয়া দেয়, তাহাই নহে, কবিকঙ্কণের 'বারমাস্যা'র বর্ষাসুলভ দুঃখের অস্তিত্বও তাহাতে অনুভব করিতে পারা যায়। এই সুখ ও দুঃখ, এই তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, এই মিলন ও বিরহের আশা-ভয়-বিজড়িত, আনন্দবেদনা-কল্লোলিত ভাবরাশি বর্ষা-প্রকৃতির সুশ্যামল নবীন সৌন্দর্য্যের উপর মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যকিরণ ও সায়াহ্নের ধূসর মেঘচ্ছায়ার তুলিকাসম্পাতে পল্লীবাসিগণের জীবন কখন হাস্যময়, কখন বিপদে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলে, সে সুখ ও সে দুঃখ উভয়ই উপভোগ্য।

বর্ষা—সহর ও পল্লীতে

ক্ষুদ্র বিনোদপুর গ্রামখানি নিতান্ত গণ্ডগ্রাম নহে, ভদ্রপল্লী—যেন পথ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, নদীপথও বৎসরের ংশকাল বিরলসলিল ও শৈবালদলরুদ্ধ থাকে। কিন্তু নদী এখন আর সঙ্কীর্ণকায়া নহে। শৈবালরাশিতে আর জলরেখা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। পদ্মার বিপুল জলরাশি,

স্রোতস্বিনী

খাল, বিল, নালা প্রভৃতি সমস্ত জলাশয় ভাসাইয়া গ্রামপ্রান্তবাহিনী সেই বিমলসলিলা সঙ্কীর্ণ তটিনীকে পঙ্কিল জলের উদ্দাম প্রবাহে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সে চাঞ্চল্য, সে তরঙ্গভঙ্গি, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তাহার অপ্রশস্ত বক্ষে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না। তাই নদী-জল 'পাউড়ী'র উপর বটগাছের স্কন্ধদেশ জলমগ্ন করিয়া আমকাঁঠালের বাগানের ভাঁট, আশ্যাওড়া ও কাল্‌কাসিন্দের জঙ্গল ডুবাইয়া গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী বান্ধের পদতলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

চতুর্দ্দিক্ জলময়

অপরদিকে দিঘীর জল মাঠের নিম্নজমীকে সরোবরে পরিণত করিয়া মেঠোপথের উভয় পার্শ্বের জুলি প্লাবিত করিয়া গ্রামের পুষ্করিণীগুলি ছাপাইয়া বর্ষার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ জলময়; গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে। এখন বিশ্বসংসারের সহিত এই গ্রামের স্থলীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায়। কিন্তু নৌকাপথে বহির্জগতের সহিত তাহার নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কত নূতন নূতন দেশে নূতন নূতন দ্রব্যপূর্ণ নৌকা আসিয়া গ্রামপ্রান্তে নঙ্গর করিয়াছে। সমস্ত গ্রামবাসী বহির্জগতের সহিত প্রীতিবন্ধনের প্রগাঢ়তা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছে।

অবিরাম বর্ষণ

বন্যার এরূপ অবস্থা, তাহার উপর বৃষ্টির বিরাম নাই। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, রাত্রে সর্ব্বক্ষণ বৃষ্টি—কখন মুষলধারে বর্ষণ, কখন অতি সূক্ষ্ম শুভ্র জলকণা। আজ সমস্ত সকাল বেলা ধরিয়া অবিরল ধারায় বর্ষণ হইয়াছে। সে বৃষ্টিধারা মস্তকে ধরিয়াই পল্লীবাসী প্রসন্নমনে তাহাদের নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে।

নদীর অপর পারে অন্ধকার, শ্যামল বনশ্রেণী ধূসর মেঘের গায়ে

মিশিয়া গিয়াছে। কূলে কূলে জলভরা, বিটপীরাশিসমাচ্ছন্ন বিজন

পরপারে

গ্রামখানি দূর হইতে ছবির মত দেখাইতেছে। বড় বড় মহাজনী নৌকা পালভরে কত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ মেঘান্তরিত গগনপথ উদ্ভাসিত করিয়া অস্তাচলযাত্রী তপনের লোহিত কিরণচ্ছটা ধারাপাতপুষ্ট সজলা শ্যামলা প্রকৃতির উপর বিকীর্ণ হইল। বোধ হইতে লাগিল, প্রকৃতির চক্ষে অশ্রু ও অধরে হাস্য শোভা পাইতেছে। বাঁশগাছের নত মস্তকে, গৃহস্থের খোড়ো চালের মটকায়, তেঁতুল গাছের সুনিবিড় পত্রাগ্রভাগে রৌদ্র ঝিক্ মিক করিতেছে।

চন্দ্রালোকে

মেঘ কাটিয়া পূর্ব্বাকাশে শুক্লপক্ষের শশধর সমুদিত হইল। সহসা বর্ষান্তে শরৎ যেন তাহার শুভ্র মহিমায় ধরাতলে বিকশিত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে সিক্ত প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। গ্রামের জলপূর্ণ ডোবা ও গর্ত্তগুলিতে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইতেছে। গৃহস্থগণের বেড়ার ধারে, রজনী-গন্ধার ঝাড় হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা কুসুম ক্ষীণবৃন্তে ভর করিয়া ঊর্দ্ধমুখে মিষ্ট গন্ধ বিকীরণপূর্ব্বক তরল জ্যোৎস্নালোক ও বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছে। কামিনী গাছের নিবিড় পত্র আচ্ছন্ন করিয়া থোকা থোকা কামিনীফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বালকবালিকাগণ জ্যোৎস্নালোকে পুলক-স্পন্দিত হৃদয়ে ঠাকুরমার কাছে রূপকথা শুনিতেছে।

নৈশ বর্ষণ

দেখিতে দেখিতে আকাশ আবার ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হইল। চন্দ্র মেঘের অন্তরালে লুপ্ত হইল। আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার

মধ্যে সমস্ত গ্রামখানি জনহীন ও সুপ্ত বোধ হইতে লাগিল। কেবল চারি দিকে জলের ঝর্ ঝর্ শব্দ, ভেকের হর্ষধ্বনি, শন্ শন্ বায়ুপ্রবাহ, অন্ধকারমণ্ডিতা বৃষ্টিপ্লাবিতা নৈশ প্রকৃতির জীবনপ্রবাহের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে লাগিল।